পসরা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

দাম একটাকা

বৈদ্যবাটী-যুবক-সমি
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টো
দ্বারা প্রকা

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রধান বিক্রয়স্থান :—রায় এম, সি, সরকার
বাহাদুরের পুস্তকালয়,
১৫।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

উপহার

বাল্যের সাথী, যৌবনের সখা, জীবনবন্ধু

শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু

মুখবন্ধ

পসরার সব ক'টি গল্পই সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে, একটু-আধটু বদলাইয়া এখন বই-এর আকারে বাহির করা হইল।

দু-তিনটি গল্পসম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার মনে করি; আশা করি, এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয়।

"যশের মূল্য" গল্পটি idealistic। ঐ হিসাবেই উহার সার্থকতা,—বাস্তব-হিসাবে দেখিলে উহা ব্যর্থ হইবে।

"জীবন-যুদ্ধে"র মূল আখ্যান-বস্তু কল্পিত নহে। কুবের, মাতাল ও সরলার চরিত্র বাস্তব-জীবন হইতে নেওয়া। কুবের ও সরলার পরিণাম ও তাহাদের শেষ সাক্ষাৎ-দৃশ্যও কপোলকল্পিত নহে। "জীবনযুদ্ধে" ঠিক গল্প নাম পাইতেও পারে না; পাঠকেরা উহাকে অন্য এমন-কিছু ভাবিয়া পড়িবেন, যাহা গল্পাতিরিক্ত, অথচ গল্পও বটে! লেখকের পূর্ব্বরচনা বলিয়া উহার দু-এক জায়গায় সামান্য উচ্ছ্বাস থাকিয়া গিয়াছে; নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য লেখক ইচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সামান্য ত্রুটিটুকু সংশোধনের অবকাশ পান নাই। অতএব, উচ্ছ্বাসে যাঁহাদের অরুচি, এই ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্য তাঁহারা লেখককে ক্ষমা করিলে বাধিত হইব।

"সোণার চুড়ী"তে দেখান হইয়াছে যে, জীবনের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা সময়ে সময়ে কতটা ভয়ানক হইয়া উঠিতে পারে। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতরে পূরিয়া রাখিলে অসতীকেও সতী বলা যায় ; কিন্তু, পৃথিবীর শত পাপের ভিতরে, প্রলোভনের ভিতরে যাঁহার সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া যায়, পরিণামে যে রমণী মন দমন করিয়া বিজয়িনী হন, আসল সতীত্বগৌরবের অধিকারিণী তিনিই। এই গল্পের নায়িকা সুযোগ পাইয়াও সুযোগকে অবহেলা করিলেন, তাঁহার চরিত্রে যে অন্যায় ও ক্ষণিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়, হিন্দুমহিলার কল্পিত আদর্শের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে তাহা খুবই স্বাভাবিক। লেখক এখানে আদর্শচরিত্র গড়িতেছেন না, তিনি জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সহিত সাংসারিক মানুষের চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা করিয়াছেন। পরিণামের সতীত্বপরীক্ষায় সফলতালাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকেরা দেখিবেন যে, এই গল্পের প্রধান চরিত্রের ক্ষণিক মানসিক দুর্ব্বলতাকেও লেখক স্পষ্টভাবে অন্যায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পাছে কেহ সন্দেহ করেন যে, লেখক দুর্নীতিপ্রচার করিয়াছেন, সেইজন্য এতকথা বলিতে হইল। যাঁহারা এই কৈফিয়তেও তুষ্ট না হইয়া, লেখকের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কোলাহল করিবেন, তাঁহারা এ গল্প না পড়িলেই বাধিত হইব। যাহা সত্য, যাহা vulgar নহে, যাহার উদ্দেশ্য সৎ, তাহাকে দুর্নীতি বলা যায় না। এরূপ একটি সত্য, শত শত কল্পিত আদর্শ অপেক্ষা অনেক উচ্চ, অনেক বড়। মুখে আমরা যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, আমাদের মন ইহাকে সত্য বলিয়া জানে, সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। একথা যাঁহারা অস্বীকার করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত দুর্নীতির প্রচারক এবং সমাজের শত্রু।

"সঙ্কল্প" নামক মাসিকপত্রে যখন "কপোতী" নামে গল্পটি বাহির হয়,

একজন সমালোচক তখন তাহার কয়েকটি দোষ দেখাইয়াছিলেন। লেখক, কৃতজ্ঞহৃদয়ে সে দোষগুলির সংশোধন করিয়াছেন।

বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও পুস্তকে দু-চারটি ছাপার ভুল থাকিয়া গেল। এজন্যও মার্জ্জনা প্রার্থনীয়। ইতি

১৩২২ ভাদ্র

প্রকাশক

সূচী

পসরা

কেরাণী

ক

"ভাত বাড়ো, ভাত বাড়ো !"

"রোসো, রোসো,—আর একটু সবুর করো।"

"সবুর ! ঘড়ীতে ন'টা বেজে এক কোয়াটার, সেটা দেখেচ কি ?"

"দাঁড়াও না, ডালটা নাবিয়ে একটা বাটা মাছ ভেজে দি' না হয় ! অমন কল্লে শরীর টেক্‌বে কেমন করে গা ! প্রাণটা আগে, না ছেয়ের চাক্‌রী আগে ?"

"চাক্‌রি আগে স্থরো, চাক্‌রি আগে ! কেরাণীর আবার প্রাণ ! কেরাণীর আবার শরীর ! সায়েব যদি তোমার এ কথা শুন্‌ত স্থরো, তা'হলে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে যেত। নাও, কথায় কথায় বেলা বেড়ে

যাচ্ছে, ছাইভস্ম যা আছে শীগ্‌গির দাও, কোনরকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এখন আপিসে গিয়ে পৌছতে পাল্লে বাঁচি।” প্রিয়নাথ ধুপ করিয়া পিড়ির উপরে বসিয়া পড়িল।

সুরবালা, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কিছু যে হয়নি, খাবে কি দিয়ে ?”

“তবে অদেষ্টে আজ নিরেট্ উপোস ! ভাতও হয়নি নাকি ?”

“হ্যাঁ, ভাত হয়েচে বৈকি ! ডালও হ'ল,—আলু ভাতে, কাঁচকলা ভা—”

“ব্যস্, ব্যস্—এ যে একটা যজ্ঞির ব্যাপার ! আবার কি চাই ? কেরাণী আবার কি খাবে ? দাও, দাও—চট্‌পট্ দাও।”

পাঁচ মিনিটে খাওয়া শেষ করিয়া, এক এক লাফে তিন-তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া প্রিয়নাথ উপরে উঠিল। তাড়াতাড়ি এদিক্-সেদিক্ চাহিয়া সে গলা চড়াইয়া ডাকিল, “ওগো—জল্‌দি।”

সুরবালা ত্রস্তপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি গা ?”

“কাপড়, কাপড়, আমার কাপড় !”

সুরবালা জিভ্ কাটিয়া বলিল, “ঐ যাঃ ! তোমায় বল্‌তে ভুলে গেচি। তোমার কাপড়ে যে খোকা মুতে দিয়েচে, এখনো শুকোয় নি।”

প্রিয়নাথ কর্কশকণ্ঠে কহিল, “আমার চাকরিটি তোমরা খাবার ফিকিরে আছ ? তার চেয়ে আমায় খাওনা কেন, একদম সব ন্যাটা চুকে যাক্।”

সেই সময়ে ক্ষুদে আসামীটি সুমুখ দিয়া যাইতে ছিল। প্রিয়নাথ হুঙ্কার দিয়া বলিল, “এই হারামজাদা, এদিকে আয়ত দেখি।”

খোকা ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া আস্তে আস্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে আসিয়া

দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ খোকার গালে এক বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া দিয়া সক্রোধে কহিল, "পাজী ছুঁচো!" চড় খাইয়া খোকা মহা চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

প্রিয়নাথ, রাগে গশ্-গশ্ করিতে করিতে যে ময়লা কাপড়খানা পরিয়াছিল, তারই উপরে একটা আধফর্শা টুইলের সার্ট চড়াইয়া দিল। সার্টের গায়ে তিনরকমের চারিটা বোতাম—একটা রূপার, একটা হাড়ের, দুটা কাঁচের। এক হাতায় বোতাম আছে, অন্যটা সূতা-দিয়া-বাঁধা। একখানি পাকানো ও কোঁচানো চাদর কাঁধে ফেলিল। পায়ে একযোড়া সাদা ক্যাম্বিসের পম্প জুতা পরিল—তার উপরে কালো বার্ণিশ চামড়ার তিন-চারিটা ছোট বড় অপারেশনের চিহ্ন। প্রিয়নাথ লোকটার সখ আছে —নাই শুধু পয়সা।

খোকা তখনও কাঁদিতেছিল। প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার দুই গালে দুটি চুমো খাইয়া বলিল, "ছি বাবা, কেঁদ না, কাঁদতে নেই।"

সুরবালা স্বামীর কাছে অন্যায় ধমক্ খাইয়া একটু মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিল। সে জানালার গরাদে ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ধারাবর্ষী মেঘমেদুর আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয়নাথ সব বুঝিল। অনুতপ্ত কণ্ঠে ডাকিল, "সুরো!"

সুরবালা, চমকিয়া মুখ ফিরাইল।

"সুরো, রাগ করেচ?"

"না।"

প্রিয়নাথ সুরবালার কাছে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,

"সুরো, তুমিও যদি আমার কথায় রাগ কর্ব্বে তা' হলে কার মুখ চেয়ে আমি বাঁচব বল? আমাতে কি আর আমি আছি? আমার কথায় রাগ? বল, রাগ করনি?"

স্বামীর স্নেহ ও প্রেমে সুরবালার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। "না, আমি রাগ করিনি" বলিয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

প্রিয়নাথ, স্ত্রীকে চুম্বন করিবার জন্য মুখ বাড়াইল। হঠাৎ ঘড়ীতে টং করিয়া সাড়ে নয়টা বাজিল। চুম্বন ভুলিয়া প্রিয়নাথ স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক লাফে ঘরের দরজার কাছে গেল। তাড়াতাড়ি ছাতিটা লইয়া ছুটিল।

খ

এই কেরাণী-জীবন, এই বাঙ্গালী-জীবন—ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ, তুচ্ছ প্রেম—তুচ্ছ বিরহ—জীবনটা শুধু তাড়াতাড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস, আর কিছু না! বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এই ছবি!

প্রিয়নাথ সদর দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, রাস্তা জলে জলময়, যেখানে জল নাই, সেখানে হাঁটুভোর কাদা। সে শীঘ্র খানিকটা ছেঁড়া খবরের কাগজ যোগাড় করিয়া জুতাযোড়া পা হইতে খুলিয়া সন্তর্পণে মুড়িয়া ফেলিল এবং তাহা বগলদাবা করিয়া জল-কাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কেরাণীর দেবালয়—যেখানে সাহেব দেবতা, বড়বাবু পূজারী ও তাহারা পাণ্ডা—তাহার উদ্দেশ্যে চলিল।

প্রিয়নাথ সুশিক্ষিত যুবক। বাপ-মা এবং প্রতিবেশীরা তাহার বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কালে সে বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। এণ্ট্রান্সে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল—

ফলে তাহার জননীর মনে অকস্মাৎ একটি রাঙ্গা টুকটুকে বধূর মুখদর্শন করিবার সাধ একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তারপর কিরূপে একে একে বর্ষে বর্ষে তাহার ঘরে মা-ষষ্ঠীর দূতেরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, তার মাতা, তারপর তার পিতার মৃত্যু হইল এবং অর্থাভাবে তাহার বি, এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না, এখানে আমরা সে সমস্ত ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণন করিতে চাহি না।

প্রিয়নাথ চলিয়াছে, দুই হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া চলিয়াছে, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। কেরাণীর ভাবনা! সবটা শুনিয়া কাজ নাই; কারণ, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই!

তাহার কত উচ্চ আশা ছিল,—কোন্ মানুষের না থাকে? ধীরে ধীরে তাহার জীবনের সাম্নে একটা মহান্ আদর্শ ভবিষ্যের পটে আত্মসম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, হয় ত কালে তাহা পূর্ণগঠন হইত; ধীরে ধীরে আপনাকে সে সংসার-সমরের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল, হয়ত, পরিণামে সে বিজয়ী হইত! কিন্তু ইতিমধ্যে প্রবাদবাক্য আপনার কঠোর সত্যতা সপ্রমাণ করিল—"মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে!" প্রিয়নাথ গড়িতেছিল! বিধাতা ভাঙ্গিল।

জীবনের প্রভাতে, উপার্জ্জনক্ষম পিতার মৃত্যুতে, প্রিয়নাথ অকস্মাৎ একদা আপনার খেদ-করুণ ভাগ্যলিপির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিল। সে কি কঠোর আঘাত! দেখিল, অনন্ত সংসার-পাথারে সে নিরাশ্রয়—একাকী! বড় একাকী! তাহার বন্ধু নাই, সহায় নাই, অর্থ নাই,—আছে শুধু স্ত্রী, চারিটী সন্তান, আর শূন্য লৌহমঞ্জুষা! আর একখানি জীর্ণভগ্ন দ্বিতল বাড়ী!

মা সরস্বতীর দিকে পিছন ফিরিয়া সে অতি কষ্টে কোন সওদাগরী আফিসে একটি ২০৲ টাকা মাহিনার চাকুরী যোগাড় করিল। পাড়ার বিজ্ঞেরা আসিয়া বলিয়া গেলেন, "চাকরীর বাজার বড় মাগ্যি! তোমার অতি সৌভাগ্য!"

তারপর এই 'সৌভাগ্যের' ভিতর দিয়া একে একে ছয়টি দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং কুড়িটি টাকার উপর আরও পাঁচটি টাকা আজ কয়েক মাস ঘরে আসিতেছে। কি 'সৌভাগ্য' রে!

হতভাগিনী সুরবালা! পরণে ছেঁড়াখোড়া কাপড়, যত্নাভাবে অমন মেঘের মত কেশরাশি রুক্ষ, অমন সোনার বরণ দেহে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! গায়ে একখানি গয়না নাই, প্রাণে এতটুকু সুখ নাই; মুখে সদাই হাসি, কিন্তু তার পিছনে যে কি হাহাকার লুকানো আছে— দরদী ভিন্ন কে তাহা বুঝিবে?

তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স আট বৎসর,—দুদিন বাদে তাহাকে পার করিতে হইবে।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এতগুলিকে লইয়া একটি সংসার,—চাল, ডাল, ঘি, তেল, নিত্য বাজার আছে, লজ্জা-নিবারণের ন্যাকড়া আছে, ছেলে-পিলের দুধ আছে, সমাজের কুটুম্বিতা আছে, নিত্য রোগের ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধ-পথ্য আছে—নাই কি? বলিতে পার মাসে পঁচিশটি টাকায় কোন্ ইন্দ্রজালে এই ভদ্র গৃহস্থের মান এবং প্রাণ রক্ষা হয়?

এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিবে, প্রিয়নাথ কি ভাবিতেছিল?

হঠাৎ একখানা দু'ঘোড়ার মস্ত চক্‌চকে গাড়ী বাতাসের আগে ছুটিয়া আসিল। প্রিয়নাথ, সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর

ভিতরে মোটা নরম গদির উপরে পরম আলস্যভরে সুসজ্জিত দেহ এলাইয়া দিয়া এক যুবক বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত, তাহার ভাব-ভঙ্গী নির্ব্বিকার, যেন সহরের যত দুঃখ, যত দৈন্য, যত হাহাকারের ভিতরে অটল-মহিমায় বধির শ্রবণে বসিয়া, সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে।

গাড়ীর চাকা হইতে কাদার ধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রিয়নাথের যত্ন-রক্ষিত সামান্য পরিচ্ছদ সুবিচিত্র করিয়া দিল। সে বিরস বদনে আপন মনে কহিল, "কেন এই বিভেদ ? কেন আমি রাস্তায় কুকুরের মত এই জল-কাদায় হাঁটিয়া চলিয়াছি, আর ঐবা কেন আরামে লোকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া, সকলকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে ? কেন আমি হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও, বিদ্যায়, রূপে, গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অর্থহীন ব্যর্থ জীবনে অর্দ্ধাহারে ছিন্নবেশে দিনের পর দিন গণিতেছি, আর ঐ মূর্খ, কদাকার পশু কেন দিব্য বেশে, বিনা শ্রমে, বিনা চিন্তায় ধূলির মত টাকা উড়াইয়া দিবার অধিকার লাভ করিল ? কেন এই প্রভেদ ? ভগবান, তুমি কি আছ ? যে তোমায়, ভগবান, সমদৃষ্টি বলিয়া প্রচার করে, প্রতারক সে—মূর্খ সে ! 'তুমি' নাই--তুমি' নাই !"

সাম্‌নে আফিস,—প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চক্‌চকে দামী পাথরের থাম, বড় বড় জান্‌লা-দরজাগুলি উজ্জ্বল রং করা। বাহির হইতে মাথা তুলিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিতে চাহিতে পথিকেরা রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে; ভাবিতেছে, কি চমৎকার বাড়ী! যেন স্বর্গপুরী ! হায়, তারা ভুলিয়া গিয়াছে, মাকালের রাঙ্গা রূপের আড়ালে কি মালিন্য !

প্রিয়নাথ ভিতরে ঢুকিল। কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। মধ্যে মস্ত একটা হল, বার্নিশকরা কাঠের ছোট ছোট দেওয়ালে তাহা

বহুভাগে বিভক্ত। স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া সে আপনাদের বিভাগে ঢুকিল।

সারি সারি টেবিল। প্রতি টেবিলের দুদিকে দুখানা করিয়া চেয়ার। একদিকে বড়বাবুর নিজস্ব একটা মেজ্। চারিদিকে কাঠের 'তাক্'—তাহাতে বড় বড় বাঁধানো খাতা। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা, 'বিজ্‌লীর আলো'। আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। ঠিক যেন বন্দী পাখীর জন্য সোনার 'পিঁজরা'!

এখনও দশটা বাজে নাই। কেরাণীরা, কেহ টেবিলের উপরে বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, দলে দলে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে!

হঠাৎ জুতার মশ্‌মশ শব্দ হইল।

"ওহে, সায়েব, সায়েব!"

পলকে কি পরিবর্ত্তন! সবাই যে যার আসনে আসীন, সামনে খাতা খোলা, চোখে জ্বলন্ত মনোযোগ, আর হাতে চলন্ত কলম! সাহেব কি একটা কাজে আসিয়াছিল; কাজ সারিয়া তখনই চলিয়া গেল। অমনি সকলের হাত হইতে কলম খসিল, দৃষ্টি অপাঙ্গে ফিরিল, একজন অর্দ্ধোচ্চ কণ্ঠে কহিল, "গেছে?"

আর একজন দরজার ফাঁক্ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "হুঁ।"

অমনি যতীনচন্দ্র একটি গান ধরিয়া দিল। আর একজন ঘাড় নাড়িয়া তবলা অভাবে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া তাল দিতে লাগিল।

এবার বড়বাবু আসিতেছেন। আবার সব চুপ্‌চাপ।

কেরাণীদের অসম্পূর্ণ ছবি এইরূপ। মানুষ যে কত হীন, কত কপট হইতে পারে, বুকে তুষানল জ্বালিয়া মুখে কত যে হাসিতে পারে, তা

যদি দেখিতে চাও, সওদাগরী আফিসের কেরাণীদের দেখ। এমন ফটো আর কোথাও পাইবে না। বুকে তুষানল, মুখে হাসির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইও না। খাঁচার পাখী কি গান গায় না?)

প্রিয়নাথ আপনার টেবিলের সুমুখে গিয়া, চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া আগে চেয়ারের হাতায় বাঁধিল। তারপর একখানা কাগজে লাল কালি দিয়া কয়েক লাইন "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়" লিখিল। এই না সে বলিতেছিল, বিশ্বে ঈশ্বর নাই? হাঁ, মানুষের স্বভাব ত' এই!

দুর্গানাম-লেখা কাগজখানি চোখ বুজিয়া বারকয়েক কপালে ছুঁয়াইয়া, সে একেবারে কাজ সুরু করিয়া দিল।

প্রিয়নাথ আফিসের কাহারও সঙ্গে সাধ্যমত মিশিত না। সে শিক্ষিত, তাহার সহকর্ম্মীদের মনের সঙ্গে তাহার উচ্চাভিলাষী মন ঠিক খাপ্ খাইত না।

তিনদিন পরেই পূজা। আফিসে কাজের বড় ভিড়। প্রিয়নাথ যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, ঘড়ীতে তখন সন্ধ্যা আট্‌টা প্রায় বাজে।

সে তাড়াতাড়ি বড়বাজারের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। রাস্তার জনতায় প্রতিপদেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তার মন যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। লোকগুলার কি অন্যায়! ইচ্ছা করিয়াই আমার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে! একটু চট্‌পট্ বাড়ীতে গিয়া যে হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিব, তারও যো নাই। আর এই গরুর গাড়ী—এগুলা কলিকাতা হইতে দূর হইলে সব আপদ্ চুকিয়া যায়, এমনি নানা উদ্ভট কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রিয়নাথ শেষে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল।

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া, ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সে ডাকিল, "সুরো!"

খোকাকে কোলে করিয়া, সুরবালা মাদুরের উপরে বসিয়াছিল। প্রিয়নাথের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিয়া চাপা আওয়াজে বলিল, "চুপ! চুপ! খোকার ভারি জ্বর!"

প্রিয়নাথ উদ্বেগের সহিত বলিল, "জ্বর!"

"হ্যাঁ। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। এখন একটু ঘুমিয়েচে, অত জোরে কথা কোয়ো না, এখনি জেগে উঠবে।"

প্রিয়নাথ,—শুষ্কমুখে খোকার গায়ে হাত দিয়া দেখিল,—গা যেন আগুন! তার সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্ক তখন উত্তপ্ত। বাড়ীতে আসিয়া কোথায় একটু বসিয়া জিরাইবে, দুটা কথা কহিবে, না, আবার এই হাঙ্গাম! সে আর সহ্য করিতে পারিল না, বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল, "না, আর অসহ্য হয়ে উঠেছে, রোজ একটা না একটা লেগে আছেই, তার চেয়ে একেবারে মরুক্ না কেন, হাড়ে বাতাস লাগে!"

সুরবালা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল. "ষাঠ ষাঠ, অমন সর্ব্বনেশে কথা কি করে তোমার মুখ দিয়ে বেরুল গা?"

প্রিয়নাথ বুঝিল, রাগের মাথায় সে একটা ভারি অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। অনুতপ্ত হইয়া তখনই সে খোকাকে কোলে করিয়া স্তব্ধ-ভাবে বসিয়া পড়িল।

ঘ

রাত্রে খোকার জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। জ্বরের 'ধমকে' সারা-

রাত সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। "বাবা, আমায় জামা দিলে না? জামা প'রে আমি ঠাকুর দেখ্‌তে যাব।"

প্রিয়নাথ তার মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "দেবো বৈকি বাবা! আগে সকাল হোক।"

ভোর হইল। খোকার জ্বর কমিল না, বরং তার উপরে ফিটের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সুরবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল, "ওগো, ডাক্তার ডাকো।"

প্রিয়নাথ বলিল, "হুঁ—ডাক্তার! সুরো, কাল মাস-কাবার, সেটা মনে আছে কি? ডাক্তার ডাকো! পয়সা কোথায়?"

সুরবালা বলিল, "তা বলে ত বিনে চিকিচ্ছায় ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌তে পারি না, কোথাও কেউ ধার্‌-টার্‌ দেবে না?"

"দেখি।" প্রিয়নাথ চটিপায়ে দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ধার মিলিল,—বহু কষ্টে। ডাক্তার আসিল, ছেলের নাড়ী টিপিল, বুক দেখিল, নাক মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ব্যামো শক্ত, দেখি, কতদূর কি কর্ত্তে পারি।"

পরদিন যথাসময়ে প্রিয়নাথ, আফিসে গিয়া হাজিরা-বইয়ে নামসই করিল। তখনও বড়বাবু আসেন নাই। অথচ, প্রত্যেক মিনিট তার কাছে এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শেষে আর সে থাকিতে পারিল না,—তাড়াতাড়ি সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া, সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

সাহেব কি লিখিতেছিল, কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই ঘাড়টি একটু হেঁট করিল মাত্র।

প্রিয়নাথ বলিল, "স্যর, আমার ছেলের বড় অসুখ, দুদিন ছুটি।"

সাহেব তেমনিভাবেই বলিল, "বাবুকে বল।"

'বাবু' মানে বড়বাবু! প্রিয়নাথ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, বড়বাবু আসিয়াছেন। বড়বাবুর গোঁফ-দাড়ী কামানো,—কিন্তু খুরের সঙ্গে বহুদিনের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায়, ছোট ছোট কর্কশ পাকা চুলে মুখের নীচের দিক্‌টা বেজায় বন্ধুর! ঠোঁটের দুপাশ দিয়া পানের পিচের ক্ষুদ্র স্রোত সদা প্রবাহিত। দেহখানি ভয়ানক মোটা, তার উপরে টান্ চাপকান। একটা সচল তাকিয়ার কল্পনা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বড়বাবুর চাপকান-চাপা স্থূল দেহের কতক আঁচ্ পাইতে পারা যায়। তাঁর আকৃতির আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেটি তাঁর মাথা যোড়া অতি চক্‌চকে বার্ণিশ-করা টাক্,—দিনের আলো পড়ায় তাহা ইস্পাতের মত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। টাকের মাঝখানে ঠিক তিনগাছি চুল; কোন রসিক তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো!

বড়বাবু চেয়ারে বসিয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে মুখ বিকৃত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ছুটির দরখাস্ত হাতে প্রিয়নাথ আসিয়া হাজির হইল।

কোনরূপ ভূমিকা করিয়া কথা পাড়ে, প্রিয়নাথের মনের অবস্থা তখন তেমন ছিল না। সে বড়বাবুর সুমুখে গিয়া সোজাসুজি বলিল, "মশাই, আমার ছেলে বাঁচে কি না বাঁচে, আমাকে দুদিনের ছুটি দিতে হবে।"

বড়বাবু তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে অবহেলাভরে বলিলেন, "ও সব ছুটিটুটি, বুঝ্লে কিনা—এখন হবে-টবে না। কাল্কে 'মেল্ ডে,' তার ওপর বুঝ্লে কি না, সাম্নে পূজো, এখন কাউকে ছাড়্তে টাড়্তে পার্ব্ব না!"

প্রিয়নাথ শুষ্কমুখে কহিল, "আজ্ঞে, ছেলেটার ব্যামো, একটিবার দয়া করুন।"

বড়বাবু একটা আল্পিন দিয়া দাত খুটিতে খুটিতে বলিলেন, "হেঁঃ, দয়া! ছেলের ব্যামো বল্লে, বুঝ্লে কি না, সায়েব মানে না।"

প্রিয়নাথ টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজচাপা উঠাইয়া লইয়া সেটা নাড়িতে নাড়িতে নিম্নমুখে বলিল, "আজ্ঞে, সায়েবের কাছে গিয়েছিলুম; তিনি বল্লেন আপনার কাছে আস্তে।"

বড়বাবু কঠোর ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "সায়েবের কাছে এরি মধ্যে ঘুরে আসা হয়েচে! ভ্যালা মোর বাপ্ রে! তবে আর কি, তুমি যখন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে,—বুঝ্লে কি না, ঘাস খেতে শিখেচ, তখন আর আমার কাছে কেন?"

প্রিয়নাথ কহিল, "আজ্ঞে, আমার ছেলে মারা যায়।"

বড়বাবু ঠোট বাকাইয়া বলিলেন, "যাওহে ছোক্‌রা যাও! ন্যাকামির আর যায়গা পাওনি, আমার কাছে এসেচ,—বুঝ্লে কি না—চালাকি কর্ত্তে! ছেলের ব্যামো!"

প্রিয়নাথ কোনরূপে রাগ সামলাইয়া বলিল, "আমাকে ছুটি দিতেই হবে।"

বড়বাবু রুল্টা তুলিয়া লইয়া সজোরে টেবিলের উপর আছড়াইয়া

মহা খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "দিতেই হবে? আমি তোমার বাবার চাকর? ইউ স্কাউনড্রেল, আমার ওপর হুকুম—অ্যাঁ?"

প্রিয়নাথের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই হৃদয়হীন পশুটাকে আচ্ছা করিয়া ঘাড়ুই দিয়া, এই ঘৃণ্য, তুচ্ছ গোলামীকে পায়ে থ্যাংলাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে চলিয়া যায়। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, ঘরে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা! ছেলের জ্বর, ঔষধ-পথ্য, ডাক্তার চাই। মেয়ে বড়, আজ বাদে কাল সেটিকে পার করিতে হইবে। ঘরের বাক্স খালি, রাত পোহাইলে পোড়া পেটের ভাবনা ভাবিতে হইবে।

এক পলকের ভিতরে, প্রিয়নাথের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত এমনি নানা চিন্তা খেলিয়া গেল এবং তখনই যেন কাহার অপূর্ব্ব সম্মোহিনীতে তাহার গর্ব্বোদ্ধত শির আবার নুইয়া পড়িল, তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত আবার শিথিল হইয়া পড়িল। কেরাণীর আবার রাগ! সে বড় ক্ষণিক!

বড়বাবুর রাসভ-নিন্দিত স্বর, বোধ হয় সাহেবের কাণে গিয়াছিল। কারণ হঠাৎ সাহেব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। একবার প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি বাবু?"

বড়বাবু সব কথা খুলিয়া বলিলেন। অবশ্য, তার উপর কালোপযোগী টীকা-টিপ্পনি করিতে ভুলিলেন না। সাহেব সমস্ত শুনিয়া প্রিয়নাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বাবুর উপর হুকুম চালিয়েছ?"

প্রিয়নাথ নিম্নস্বরে বলিল, "না, স্যর!"

সাহেব অধীরভাবে ওষ্ঠ দংশন করিয়া বলিল, "তুমি কি বলতে চাও, আমার বাবু মিথ্যাবাদী?"

প্রিয়নাথ কহিল, "না স্যর ! আমি তা বল্‌তে চাই না, তবে উনি কথাটা একটু বাড়িয়ে বলেছেন।"

বড়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "তবে রে ছুঁচো ! আমার সাম্‌নে তুই আমারি নামে লাগাস। এত বড় বুকের পাটা তোর ! স্যার ! স্যর্ ! ওকে ডিশ্চার্জ্জ করুন, এখনি ডিশ্চার্জ্জ করুন।"

সাহেব মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর শিষ্ দিতে দিতে দরজার কাছে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল, "তোমার ছেলের অসুখ ?"

"হ্যাঁ স্যর।"

সাহেব একান্ত সহজ স্বরে বলিল, "আচ্ছা বাবু, আজ তোমার ছুটি। কিন্তু কাল 'মেল-ডে', তুমি অবশ্য আস্‌বে। আমি তোমার পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করি।" বলিয়া আবার শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

সাহেবের এই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবপরিবর্ত্তনে বড়বাবু রাগে ফুলিতে ফুলিতে হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তা'র'ব অত্যধিক মনোযোগিতার সহিত একখানা কাগজ দেখিতে দেখিতে আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ? আচ্ছা, দেখা যাবে। এক পোষে শীত পালায় না।"

ঝড়ের আগে শুক্‌না পাতা যেমন করিয়া উড়িয়া যায়, প্রিয়নাথের প্রাণখানা দেহের আগে তেমনি ছুটিয়া চলিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, পাখীর মত যদি আমার দুখানা ডানা থাকিত !

বাড়ী পৌছিয়া সে ভাবিল, এই ত বাড়ী আসিলাম। এইবার খোকাকে দেখিব। তার জন্যে জামা কিনিয়া আনিয়াছি ; জামা পাইয়া তাহার কত আহ্লাদ হইবে !

"সুরো, সুরো!"

কাহারও সাড়া নাই! এ কি,—কে যেন কাঁদিতেছে না? কে কাঁদে? কে? কে? প্রিয়নাথ দু হাতে বুক চাপিয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে সাহস হইতেছিল না, তবু—সে শুনিতে লাগিল।

"খোকারে, ওরে আমার খোকারে,"—কে কাঁদে? সুরো? প্রিয়নাথের দেহ হিম হইয়া গেল। আর তবেত' সন্দেহ নাই! থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে সে বসিয়া পড়িল,—তাহার চোখের সামনে,—আলোকাম্বরা ধরণীর উপর কে যেন একটা অন্ধকারের পর্দ্দা ফেলিয়া দিল। এবং সেই কঠোর-কালো আঁধারের গভীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া, এক শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয় ভেদ করিয়া কি করুণ ক্রন্দন তাহার অভিভূত শ্রবণে বারবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও খোকা, খোকারে!"

শুনিতে শুনিতে সহসা তীব্র আঘাতে চেতনা প্রাপ্ত আহতের মত সে আবার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং দীপ্তনেত্রে রক্তহীন মুখে উর্দ্ধে অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া ক্ষিপ্তের মত বলিল, "নিয়েছ? আর দু'দণ্ড তর্ সৈল না? ভগবান্? ভগবান্? এখন যদি একবার তোমার নাগাল পাই, তাহলে জেনো, তোমার ওই নির্দ্দয় প্রাণকে এই দুই হাতের চাপে পিষে, থেঁতলে গুঁড়িয়ে,—ছুঁড়ে ফেলে দি।"

প্রিয়নাথ উপরে উঠিল, এই ভীষণ অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে একটা দমকা বাতাসের মত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র, সুরবালা বিদীর্ণকণ্ঠে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

প্রিয়নাথের চোখে এক ফোঁটা জল নাই—আপনার পাষাণ-চক্ষু মেলিয়া

প্রাণপণে সে চাহিয়া রহিল। বিছানার উপর খোকার পুষ্প-পেলব দেহ পড়িয়া আছে,—মৃত্যুর কঙ্কাল-করের কাঠিন্য এখনও তাকে ছুঁইতে পারে নাই। তার ছোট হাতদুটি মুঠা-করা, কচি-কচি ঠোঁট-দুইখানির ফাঁকে মুক্তার মত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে। চোখদুটি মুদিয়া আছে, পাতার পাশে রাঙ্গা গালের উপর অশ্রুর শুষ্ক চিহ্ন।

'তুই কেঁদেচিস্, ঘুমোবার আগে কেঁদেচিস্ যাদু? আবদার ভুলতে পারিস্ নি? এই যে বাবা, জামা কিনে এনেচি। নে, পর্—জামা পর্।"

প্রিয়নাথ সন্তর্পণে কাগজের ভিতর হইতে জামাটি আস্তে আস্তে বাহির করিল। তারপর খোকাকে জামা পরাইয়া তার মৃতদেহ বুকে চাপিয়া, তার অসাড় মুখে মুখ দিয়া সেইখানে স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল।

* * * * * *

টং।—

পরদিনের বেলা সাড়ে নয়টা।

টুইলের জামা-গায়ে, কাঁধে চাদর দিয়া, হাতে ছাতা লইয়া প্রিয়নাথ বাড়ী হইতে বাহির হইল।

খোকার চিতার ধোঁয়া তখনও বুঝি মিলায় নাই,—কিন্তু কি করিবে সে? আজ যে সওদাগরের "মেলডে"—সে কেরাণী। দিনের বেলা কলম ধরিবে, রাত্রে কান্নার ছুটি মিলিবে। এখন কাঁদিবার অবকাশ নাই। আজ যে সওদাগরের "মেল ডে,"—সে যে কেরাণী!

স্মৃতির শ্মশানে

ক

সুখেন্দুর সঙ্গে ডাক্তার বরেন্দ্রনাথের আলাপ হইয়াছিল, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে।

গল্প লিখিয়া সুখেন্দু অল্প নাম করে নাই। সত্য বলিতে কি, তাহাকে লইয়া বাঙ্গলা মাসিকের সম্পাদকগণের ভিতরে দস্তুরমত 'টাগ্ অফ্ ওয়ার' বাঁধিয়া গিয়াছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাল ছোটগল্প "ডুমুরের ফুলের" মত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে; অথচ মাসিকের পাঠক চায় খালি গল্প আর গল্প!

অতএব হঠাৎ যদি কোন একজন ভাল গল্পলিখিয়ের খোঁজ পাওয়া যায়, সম্পাদকদের ভিতরে তবে 'দেহি দেহি' রব উঠিতেও দেরি হয় না। এবং নিলামে যেমন নানাদিক্ হইতে দর-হাঁকাহাঁকি হইতে থাকে, এখানেও তেমনি একপক্ষ হাঁকেন যত টাকা, অন্য পক্ষ হাঁকেন তার দ্বিগুণ, আর এক পক্ষ ত্রিগুণ। দর যাঁর বেশী, মাল পান তিনি।

এই দুর্ভিক্ষের বাজারে, সুখেন্দু বেশ অল্পদিনের ভিতরেই নাম জাহির করিতে পারিয়াছিল এবং সুখেন্দুর সাহিত্য-কুঞ্জের ভিতরে বাণীর বীণা-গুঞ্জনের তালে তালে কমলার রজত-চক্রের মধুর শিঞ্জিনী উঠিয়া তাহার প্রাণ-মন তৃপ্ত করিয়া দিত।

নাম হইলে লেখক সমাজে দুর্মুখ শত্রু বাড়ে বটে, কিন্তু সুখের কথা এই যে, পাঠক-সমাজে সেই সঙ্গে মিষ্টমুখ মিত্রের সংখ্যাও বর্দ্ধিত

হয়। সুখেন্দুর অনেকগুলি ভক্ত পাঠকের মধ্যে ডাক্তার বরেন্দ্রনাথও একজন।

বরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুখেন্দুর আলাপ বেশীদিন হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীতে দেখা যায়, একজনের সঙ্গে জন্মাবধি একত্র বাস করিয়াও প্রকৃত বন্ধুত্বের মধুর সম্বন্ধ হইল না, কিন্তু তিনটি দিনের আলাপে আর একজনের সঙ্গে হয়ত, প্রাণের বিনিময় হইয়া গেল। আসল কথা, মনের মিল, বন্ধুত্বের প্রথম সোপান। আর এইজন্যই, দুইদিনের পরিচয়েই সুখেন্দু ও বরেন্দ্রনাথের ভিতর হইতে ব্যবধানের যবনিকা সরিয়া গিয়াছি ল।

টেবিলের উপরে ব্যালজ্যাকের পাষাণময়ী মূর্ত্তির নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বসিয়া সে দিন প্রভাতে সুখেন্দু গল্পরচনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিল।

ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যিকগণের মূর্ত্তিচিত্র বিলম্বিত। একদিকে সারি সারি কতকগুলি আল্‌মারি সাজান, তাহাদের ভিতর হইতে সোনার-জলে-লেখা পুস্তকের নামগুলি ঝক্‌মকিয়া উঠিতেছে। সুখেন্দুর ঠিক সামনেই একটি খোলা জানালা। তাহার ভিতর দিয়া চাহিলে বাহিরের বাগানের সজীব সবুজ রংএর মাঝে মাঝে বাতাসে-দোদুল গোলাপ ফুলের রাঙ্গা রাঙ্গা মুখগুলি নজরে পড়িয়া যায়। লিখিতে লিখিতে সুখেন্দুর মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সে মুখ তুলিয়া উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এবং নবীন শ্যামলতার সেই অভিরাম লীলা দেখিয়া তাহার মস্তিষ্ক আবার সতেজ হয়, তাহার প্রাণে আবার নূতন উদ্যম আসে।

সুখেন্দু একমনে লিখিতেছে, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া তাহার হাতে একখানি 'কার্ডি' দিল।

'কার্ড'খানা হাতে করিয়া লইয়া সুখেন্দু পড়িল, 'ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবুকে এখানে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে পর সুখেন্দু আস্তে আস্তে লিখিবার খাতাখানি মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিল। তাহার পর একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল।

ইতিমধ্যে বরেন্দ্রনাথ সহাস্যমুখে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুখেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া, তাঁহার দিকে একখানা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "বসুন। কেমন আছেন?"

বরেন্দ্রনাথ বসিয়া বলিলেন, "ভাল। আপনি?"

"আমিও তাই।"

বরেন্দ্রনাথের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইবে। খুব সুপুরুষ না হইলেও দেখিতে তাঁহাকে মন্দ নয়। বেশ দীর্ঘ দেহ, শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল আকৃতি। মুখখানি হাসি-হাসি, চোখ দুইটিতে সরলতা যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা সুখবর সুখেন্দুবাবু! দিনরাত সেধে সেধে যাঁর মন পাইনে, আপনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর প্রাণ হরণ করেছেন।"

সুখেন্দু হাসিয়া কহিল, "যৌবরাজ্য থেকেত' অনেক দিন নির্ব্বাসিত হয়েচি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কারুর প্রাণ ত কৈ হরণ করতে পারলুমই না! তা, সেজন্যে আমার বিশেষ কোন দুঃখ নেই, কারণ সকলে সব কাজ পারে না। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন দেখি!"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার 'প্রেমের পরখ' নামে গল্পটি পড়ে

আমার স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর মতে উদীয়মান গল্পলেখক-দের ভেতরে আপনি শ্রেষ্ঠ আসন পাবার অধিকারী।”

সুখেন্দু এই প্রশংসায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, “তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌বেন যে, তিনি কখনও ভাল সমালোচক হতে পার্ব্বেন না, কারণ তিনি অত্যুক্তি করেচেন।”

বরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নি—আমারও ঐ মত।”

সুখেন্দু বলিল, “তাহলে আমি নাচার।”

বরেন্দ্রনাথ চেয়ারখানা সামনের দিকে আর একটু সরাইয়া আনিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, ও কথা এখন থাক্—আপনার সঙ্গে আমার আর একটা কথা আছে।”

সুখেন্দু সিগারেটে একটি টান দিয়া বলিল, “আমিও শোন্‌বার জন্যে প্রস্তুত আছি।”

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনার হাতে কি আজকাল বেশী কিছু কাজ আছে?”

সুখেন্দু বলিল, “একটা লেখা শেষ কর্ত্তে বাকী আছে বটে। তা সেটা বোধ হয় আজ্‌কেই শেষ হয়ে যাবে—তারপর কিছুদিন বিশ্রাম কর্ব্ব।”

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তাহলে চলুন না—কিছুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসি।”

সুখেন্দু বলিল, “বাইরে! কোথায়?”

“মধুপুরে। এ অনুরোধ শুধুই যে আমার একার, তা মনে কর্‌বেন না, আমার স্ত্রীরও এতে বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে জানবেন। আপনি

যদি আমাদের সঙ্গে যান, তাহলে আমাদের প্রবাসের দিনগুলো বড় সুখেই কেটে যাবে। কি বলেন ?”

সুখেন্দু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, “আপনাদের এই অযাচিত অনুরোধ ঠেল্‌তে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। বেশ, তাহলে কবে যাচ্ছেন ?”

“কাল সকালেই।”

“কাল সকালেই! তাহলে দুদিনের জন্যে আমাকে মাপ কর্ত্তে হবে বরেনবাবু! আপনারা আগেই যান, দুদিন পরে আমি যাব! আপনাদের ঠিকানা কি ?”

ঠিকানা বলিয়া বরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বলিলেন, “আজ তবে আসি !”

“আসুন” বলিয়া সুখেন্দুও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তাহলে এই কথাই রৈল—দেখ্‌বেন, ভুল্‌বেন না !”

একটি নমস্কার করিয়া বরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

সুখেন্দু জানালার কাছে গিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ বাগানের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর আপনমনে বলিল, “বরেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই তাঁর স্ত্রীর কথা বলেন। বোধ হয় তাঁর পারিবারিক জীবন খুব সুখের। কেন হবে না! আমার মত একলা আর কে আছে ? তবু সাহিত্য আছে বলে বেঁচে আছি—নইলে আমার জীবনটা কি হত !—ওঃ !”

খ

তিনদিন পরে সুখেন্দু মধুপুরে আসিয়া ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িল।

বরেন্দ্রনাথ তাহার জন্য ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা কুলি ডাকিয়া, তাহার মাথায় সুখেন্দুর ট্রাঙ্কটি তুলিয়া দিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইলেন।

বাহিরে আসিয়া সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাংলো কত দূরে ?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পাঁচ মিনিটের পথ। আপনি আস্‌বেন শুনে আমার স্ত্রী যে কতটা সুখী হয়েচেন, তা আর বলা যায় না। আপনারা কবিমানুষ, তাই আপনার জন্যে তিনি পাহাড়ের দিক্‌কার একটা ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন ; সে ঘরের জান্‌লা খুলে দিলেই সামনে পাহাড় দেখা যায়।"

সুখেন্দু মনে মনে বরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর এই সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, "আপনারা ব্রাহ্ম—স্ত্রীলোককে যথেষ্ট সুশিক্ষা দেন, তাই তাঁরাও শিক্ষিত পুরুষের মনের গতি কি রকম, সেটা ভালরকমেই আন্দাজ করতে পারেন। দেখুন, আপনার স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা হতেন, তাহলে তিনি আমাকে দেখ্‌বার আগে কি এতটা বুঝে-সুঝে কাজ করতে পার্ত্তেন! আমার ত মনে হয় না। আমরা সকলে এই সত্যটা বুঝ্‌তে পারি না। আমাদের অনেকে মনে করেন, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখালে তাঁরা গৃহস্থালীর দিকে আর ফিরে চাইবেন না—খালি নবেলই পড়বেন, নবেলই পড়বেন। তাই এদেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী মাত্র—সহধর্ম্মিণী নন্। স্ত্রীলোককে আমরা শুধু অশিক্ষিতা রাখি না—বাইরের পৃথিবী থেকে একরকম নির্ব্বাসিত করে রাখি। আর বাড়ীর ভেতরেও কি তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে! অন্তঃপুরেও ঘোমটা দিয়ে

তাঁদের মুখবন্ধ! শ্বশুরকে তাঁরা পিতা বলেন, অথচ মুখে ঘোমটা! এ যে কি রকম লজ্জা, আমি ত তা বুঝতেই পারি না।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ ভাবটা এখন ঢের কমে এসেচে।"

সুখেন্দু কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক; কিন্তু কমান' হয়েচে বলে সমাজপতিদের মুখও যথেষ্ট রক্তবর্ণ হয়ে উঠেচে!"

এইরূপ কথা হইতে হইতে দু'জনে অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। বরেন্দ্রনাথ কিছু তফাতে একখানা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর এসে পড়েচি,—ঐ আমার বাংলো।"

সুখেন্দু কহিল, "জায়গাটি বেশ নিরিবিলি ত?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, নিরিবিলি দেখেই ত এখানে বাংলো তৈরি করিয়েচি। কল্‌কাতায় সারা বছর লোকের গোলমালে আর গাড়ী-ঘোড়ার ঘড়্‌ঘড়ানিতে কাণ ঝালাফালা হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি একটু শান্তি পাবার জন্যে। তা এখানে এসেও যদি সেই হৈ-চৈ সইতে হয়, তা'হলে সহর ছেড়ে আর এখানে আস্‌বার দরকার কি? ওদিকে নয়,—আমাদের ঢোকবার পথ এই দিকে।"

মেদিপাতার বেড়ার মাঝখানে একটি ছোট্ট গেট্। গেটের পরেই লাল কাঁকর-ছড়ান একটি সরু পথ। পথের দু'ধারে ক্রোটনের সারি, তারপরে যন্ত্র-কর্ত্তিত দূর্ব্বায় ভরা দুইখণ্ড সমতল ভূমি। ভূমির ঠিক মধ্যস্থলে দুটি মর্ম্মররচিত বিবসনা রমণীমূর্ত্তি সলজ্জ ভঙ্গীতে নতদৃষ্টিতে যেন আপনাদের বসনমুক্ত অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছে! চারিদিকে কত ফুলের গাছ! গাছে গাছে কত ফুল!—কোনটি রক্তরাঙ্গা, কোনটি ফিকে লাল, কোনটি গাঢ় নীল, কোনটি ধব্‌ধবে সাদা, আবার কোনটি বা

বেগুনী! চলিবার পথটি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি কৃত্রিম নির্ঝরকে বেষ্টন করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। নির্ঝরের বারিরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যকর মাখিয়া নিম্নের কতগুলি প্রস্তরগঠিত নৃত্যশীল শিশুর উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তার সম্মুখেই বাংলো! এই বাগানঘেরা বাংলোখানির দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, ইহার অধিকারীর সখ আছে, রুচি আছে, পয়সা আছে।

সুখেন্দুকে লইয়া বরেন্দ্রনাথ বাহিরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুখেন্দুর সুমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিলেন, "বসুন। ততক্ষণে আমি ভেতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে ডেকে আনি। আগে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়াটা দরকার।"

সুখেন্দু বসিয়া বসিয়া ঘরখানি দেখিতে লাগিল। দেয়ালে খানকতক ছবি, একটি মার্ব্বেলের টেবিল ঘিরিয়া কয়খানা বেণ্টউড, এককোণে ইজি চেয়ার ও তার পাশে একটি টেবিল-হার্‌মোনিয়াম ছাড়া ঘরের ভিতরে ঘরে আর কোন সরঞ্জাম ছিল না। কিন্তু সাজাইতে জানিলে সরঞ্জাম অল্প বলিয়া গৃহসজ্জার কোনই ত্রুটি ঘটে না। সুখেন্দুও সেই কথা ভাবিতে-ছিল; কারণ, এই ঘরখানির সরল সজ্জাকৌশলের ভিতরে সে দুইখানি সুনিপুণ হস্তের সন্ধান পাইয়াছিল।

এমন সময়ে পিছনে পদশব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিল, একটি রমণীর হাত ধরিয়া বরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। দেখিয়া, সুখেন্দু একটু সঙ্কুচিত ভাবে মাথা নীচু করিল।

তাহার সাম্‌নে আসিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সুখেন্দুবাবু, ইনিই আমার গৃহিণী—আর ইনি হচ্ছেন সুখেন্দুবাবু।"

সুখেন্দু নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল; কিন্তু রমণীর দিকে চাহিয়াই তাহার দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল। সে মুখ যে বড়-চেনা! আজ অনেক বছর সে মুখ দেখে নাই বটে, এবং আর যে কখনও দেখিবে এ আশাও তার ছিল না বটে, কিন্তু এই অদর্শন ও হতাশা সেই প্রিয় মুখের স্মৃতি কিছুমাত্র মলিন করিতে পারে নাই—ও মুখের প্রতি রেখাটি, প্রতি তিলটি পর্য্যন্ত তার কাছে সুপরিচিত! সুখেন্দু বিমূঢ়ের মত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ মজুমদারেরও সেই অবস্থা।

জড়িতস্বরে সুখেন্দু কহিল, "সরযূ!"

স্বপ্নাবিষ্টার মত মিসেস্ মজুমদার বলিলেন, "সুখেন্দু!"

বরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে একবার নিজের স্ত্রীর দিকে, আর একবার সুখেন্দুর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন। তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে পর তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি! দুজনের ভেতরে 'মেণ্ট্যাল্ টেলি-প্যাথি'তে আগে থাক্‌তেই চেনাশুনো হয়ে গেছে না কি? এযে অবাক্ কাণ্ড—অ্যাঁ!"

ততক্ষণে সুখেন্দু আত্মসংবরণ করিয়াছে। ধীরে ধীরে সে বলিল, "বরেন্দ্রবাবু, সরযূ যে আপনার স্ত্রী আগে তা জানতুম্ না। সরযূর সঙ্গে ছেলেবেলাই আমার আলাপ হয়েছিল, সরযূর পিতা তখন আমাদের দেশ—শান্তিপুরেই থাক্‌তেন। তারপর আজ আট বছর সরযূর কোন খবর জানি না।"

বরেন্দ্রনাথ মস্তক আন্দোলন করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "বটে, বটে, বটে!"

গ

একটু বিশ্রামের জন্য সুখেন্দু, তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটি ছোট। জানালার ধারে একটি টেবিল, তুখানি চেয়ার ও একটি ছোট 'বুক্‌কেশ' সাজান রহিয়াছে। আর একদিকে একখানি 'ক্যাম্প্‌'-খাটে পালকের মত সাদা বিছানা পাতা।

সুখেন্দু একেবারে শয্যায় গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল। এবং শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

সেই পুরাতন কথা!

সরযূর পিতা দেবেন্দ্রবাবু সরকারি কাজ লইয়া তাহাদের দেশে বদ্‌লি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ী ছিল তাহাদের বাড়ীর পাশে।

সরযূ তখন ছোট,—আট বছরের মেয়ে। সে তখন বালক। তুইজনে সে যে কি ভাব ছিল! সরযূ দিনরাত তাহাদেরই বাড়ীতে থাকিত। সরযূকে ছাড়িয়া সে থাকিত পারিত না, তাহাকে ছাড়িয়া সরযূ থাকিতে পারিত না। একজন খাবার পাইলে অন্যকে ভাগ না দিয়া একা খাইত না।

বাদলে সেই অকারণে মাঠে মাঠে তুজনের জলে ভেজা! নালার জলে সেই কাগজের নৌকা-ভাসান, তরপর কার নৌকা কতদূরে গেল বলিয়া সেই তর্ক করা! সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমার কোলে শুইয়া সেই সুয়ো-রাণীর তুয়োরাণীর গল্প শোনা! তারপর তুজনে তুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই একশয্যায় ঘুমাইয়া পড়া।

সেদিন গিয়াছে।

তারা তু জনে তুজনকে ভালবাসে, এর বেশী আর কিছু জানিত না।

জানিবার দরকারও ছিল না। এখন জানিয়াছে, সে ছিল ভাই-বোনের ভালবাসা।

তারপর, সরযূও বড় হইল, সেও বড় হইল। লেখাপড়া শিখিবার জন্য সে কলিকাতায় গেল। ছুটির সময় দেশে আসিলে, সরযূর সঙ্গে দেখা হইত। কিন্তু তখন আর তারা খেলা করিত না—সে সময় তখন গিয়াছে। তখনও তারা কথা কহিত—কিন্তু সে শিশুর কথা নয়,—পুস্তকের কথা, জ্ঞানের কথা, নানা দেশের কথা!

দেবেন্দ্রবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম। মেয়েকে যত্ন করিয়া তিনি লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন। তাই সরযূও তার কথা বুঝিতে পারিত, তার মন বুঝিতে পারিত, বোকার মত তার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত না।

দুজনের এই ভালবাসা উভয়পক্ষের অভিভাবকগণ সস্নেহে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার পিতামাতার ইচ্ছা ছিল সরযূকে পুত্রবধূ করেন। ইহাতে দেবেন্দ্রবাবুরও অমত ছিল না। কিন্তু উভয় পক্ষের ধর্ম্মভেদ এই ইচ্ছা সফল হইতে দিল না।

এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবু অন্যত্র বদ্‌লি হইলেন। যাইবার দিন সে, সরযূর হাতে হাত রাখিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে সরযূর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহারা কেহ কোন কথা কহিল না—কেবল বিষাদম্লান দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। বাক্য তাঁহাদের মনের ব্যথা প্রকাশ করিতে পারিল না—কিন্তু সেই মৌন দৃষ্টি তাহাদের কাতর হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া দিল। নীরব সন্ধ্যার সেই আসন্ন অন্ধকারে চিরদিনের জন্য সে সরযূর কম্পিত স্কন্ধের উপরে আপনার ভারাক্রান্ত মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল

এবং আর একজনের তপ্ত অশ্রু অলক্ষিতে তাহার আনত কণ্ঠকে সিক্ত করিয়া দিয়াছিল!

তারপর স্বপ্নের ছবি মিলাইয়া গেল। হায় রে, সে যে বোবার স্বপন! সে স্বপ্নকাহিনী অদ্যাবধি অন্য কেহ শুনে নাই—জানে নাই।

তারপর নয়বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; সংসারের কর্ম্ম-প্রবাহে সরযূ-ফুল কোথায় ভাসিয়া গেল—তাহার ঠিক-ঠিকানা সে পাইল না।

সে আর বিবাহ করিল না। কেন করিল না, কেহ তার কারণ জানিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, সে শুধু বলিত, "ইচ্ছা নাই।"

আজ দীর্ঘকাল পরে একান্ত আকস্মিকভাবে সেই বিস্মৃত স্বপ্ন আবার স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রাণের নিভৃত নিকেতন হইতে কে যেন আজ ব্যথিত স্বরে গায়িতেছে—

"সে পুরাণ দিনের কথা ভুলব কি রে হায়,

* * * *

ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশী গান গেয়েছি বকুল তলায়,
মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি গেলাম কে কোথায়,
আবার যদি দেখা হলো প্রাণের মাঝে আয়!"

আয়, আয়, আয়—প্রাণের মাঝে আয় রে আয়! কে আসিবে? কেন আসিবে?

ঘ

সন্ধ্যার সময়ে, সকলে বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে চাকর আসিয়া সকলের জন্য চা রাখিয়া গেল।

সরযূ চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "লতাকে ডেকে দিয়ে যা।"

লতা সরযূর মেয়ের নাম,—তাহার এই একমাত্র সন্তান। অল্পক্ষণ পরেই লতা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এতক্ষণ একটা কাঠের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিয়া তাহাকে চালাইবার জন্য হরেক্‌রকমের চেষ্টা করিতেছিল,—কিন্তু সেই কাঠের ঘোড়াটা এমনি অবাধ্য যে, তাহার হাজার ছিপ্‌টি খাইয়াও সে এক পা নড়িতে রাজি হইল না। কাজেই লতা চটিয়া গিয়া আসিবার সময়ে লাগাম ধরিয়া তাহাকে হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিল। এবং ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ঘোড়াটাকে দুই হাতে তুলিয়া দুম্ করিয়া মাটিতে আছ্‌ড়াইয়া রাগত স্বরে বলিল, "ছাই ঘোড়া, দুষ্টু ঘোড়া—চল্‌তে জানে না, কিচ্ছু জানে না!"

বরেন্দ্রনাথ অট্টহাস্য করিয়া ঘরখানা কাঁপাইয়া তুলিয়া বলিলেন, "বটে, বটে, বটে!"

সুখেন্দু লতাকে টানিয়া আনিয়া আপনার কোলে তুলিয়া নিল। তারপরে দুইহাতে তার নরম নরম গালদুখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহার কোঁকড়া-চুলে-ঘেরা মুখখানি সস্নেহে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "সরযূ, ছেলেবেলায় তুমি যেমনটি ছিলে, তোমার মেয়েটী যে ঠিক্ তেমনি দেখ্‌তে হয়েচে!"

সরযূ একবার মেয়ের দিকে, আর একবার সুখেন্দুর দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিতে চাহিয়া, আনত, সলজ্জমুখে চামচে করিয়া চায়ের পিয়ালায় চিনি মিশাইতে লাগিল।

বরেন্দ্রনাথ কৌতুকভরে বলিলেন, "বলুন ত সুখেন্দুবাবু! আমার ইনি ছেলেবেলায় কেমনটি ছিলেন—খুব শান্ত, না দুষ্টু?"

সরযূ চায়ের পিয়ালার দিকে আরও বেশীরকম মনোযোগ দিল।

সুখেন্দু একবার সরযূর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেজায় দুষ্টু! একটি উদাহরণ দিচ্ছি, শুনুন।"

সরযূর রক্তারক্ত মুখ টেবিলের উপরে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সুখেন্দু সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ—শুনুন। একবার আমার মা, সরযূ আর আমাকে একএকটি রসগোল্লা দেন। আমি বুদ্ধিমানের মত রসগোল্লাটী টপ্ করে মুখের ভেতরে ফেলে দিলাম। কিন্তু একটি রসগোল্লায় সরযূর মন কিছুতেই উঠল না। রসগোল্লাটী অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে উনি সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন, 'আমি একৃতা খাবুন না—দুতো খাবুন!' খাবুনটা কি বুঝেচেন? উনি তখন 'খাব' বল্‌তেন না—'খাবুন্' বল্‌তেন। ছেলেবেলা থেকেই মৌলিকতার প্রতি ওঁর এতটা ঝোঁক ছিল!"

সরলপ্রাণ বরেন্দ্রনাথ ততক্ষণে দুইহাতে পেট চাপিয়া হাসিয়া হাসিয়া প্রায় মারা পড়িবার যোগাড় হইয়াছেন। অনেক কষ্টে শেষটা হাসি থামাইয়া তিনি চেয়ারের উপরে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "বটে, বটে বটে!"

সরযূ সকোপকটাক্ষে সুখেন্দুর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওগো, যেও না, যেও না! তুমি গেলে আমরাও তোমার পশ্চাতে ধাবমান হব।"

সরযূ অভিমানের সুরে বলিল, "আমাকে একলা পেয়ে এমন করে জব্দ করা হবে, আর আমি বুঝি চুপটি করে বসে বসে তাই সইব?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন, তুমিও তোমার পক্ষসমর্থন কর্‌তে পার!"

সরযূ ভুরু বাঁকাইয়া বলিল, "যাও, যাও, অত রসিকতায় আর কাজ নেই! ভালমানুষের মত চা খাবে ত' খাও, নইলে আমি কখ্‌খনো এখানে থাক্‌বোনা, কখ্‌খনো না! আগে থাক্‌তে এ কথা বলে রাখলুম কিন্তু!" বলিয়া, সরযূ আবার আস্তে আস্তে আসনে আসিয়া বসিল।

চা-পান করিতে করিতে বরেন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রসঙ্গ তুলিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা সুখেন্দুবাবু, আমি লক্ষ্য করে দেখেচি, আপনার অধিকাংশ লেখার ভেতরে কেমন একটা চাপা বেদনার সুর আছে। অথচ, লোকের সঙ্গে কথাবর্ত্তায় আপনি ত' বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি কর্‌তে পারেন! এর কারণ কি?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুখেন্দুর মুখ মলিন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তারপর চায়ের পিয়ালাটি টেবিলের উপরে নামাইয়া রাখিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আপনি যে আমার লেখার ভেতরে এতটা লক্ষ্য করচেন, তা আমি জানতাম না। দেখুন বরেনবাবু, লোকে বাইরের কথাবার্ত্তায় আপনাকে ভুলতে চায়,—কিন্তু লেখায় যে যথার্থ প্রাণটী আপনি প্রকাশ হয়ে যায়! হয় ত' আমার প্রাণের সুর—বেদনার সুর। তাই লেখাতেও সেটী বেজে ওঠে। কৃত্রিমতা নিয়ে আপনাকে ঢাকা দিয়ে ত' সাহিত্য সৃষ্টি হয় না বরেনবাবু! যে লেখায় লেখক নিজে হাসেন, সে লেখায় পাঠকও না হেসে পারে না। যে লেখায় লেখক নিজে কাঁদেন, সে লেখা পড়ে পাঠককেও কাঁদ্‌তে হয়। আর পাঠকদলকে নিয়েই যখন আমাদের কারবার, তখন প্রাণের আসল রূপটিকে আমরা লেখাতে ফোটাতে বাধ্য।"

বরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাহলে আপনার লেখা পড়ে বলতে হয়, আপনার প্রাণের ভেতরে যাতনা আছে।"

সুখেন্দু অস্ফুট স্বরে বলিল, "যা মনে করেন।"

বরেন্দ্রবাবু চায়ের পিয়ালায় চুমুক্ দিয়া কহিলেন, "সুখেন্দুবাবু, এ রকম প্রাণ নিয়েত' সংসার করা চলে না।"

সুখেন্দু চা পান শেষ করিয়া পিয়ালাটি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "তা আমি জানি। তাই বিবাহ করাও আর হয়ে উঠ্‌ল না। সংসারের সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক কি?"

সুখেন্দু যে বিবাহ করে নাই, সরযূ একথা জানিত না। আজ সুখেন্দুর মুখে এই কথা ও তাহার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। পাছে তাহার মুখের ভাব সুখেন্দুর নজরে পড়ে, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আলোর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

বরেন্দ্রনাথেরও চা-পান শেষ হইল। তিনি টেবিলের ধার হইতে উঠিয়া ইজিচেয়ারের উপরে গিয়া পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন। লতাও অনেকক্ষণ আগে একটা কাচের পুতুলকে বুকের উপরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এরকম চুপচাপ বসিয়া থাকা বরেন্দ্রনাথের স্বভাব নয়। সকলের আগে তিনিই কথা কহিলেন। বলিলেন, "একি, সব যে থেমেথুমে পড়্‌ল! এখনো রাত হয়নি, খাবার হতে অনেক দেরি। এতটা সময় কি করা যায়? আচ্ছা, তুমি একটা গান গাও গো,—ওঠ!"

কথাটা সরযূকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। সরযূ ম্লানভাবে বলিল, "আমার আজ গলা ভাল নেই,—আমি গাইতে পার্ব্ব না।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গলার জন্যে কিছু এসে যাবে না। এখানে ত' বাইরের কোন লোক আর উপস্থিত নেই! নাও,—উঠে পড়।"

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে অপত্তি জানাইয়া বলিল, "না, আমি কিছুতেই গাইতে পার্ব্ব না।"

বরেন্দ্রনাথ তখন হতাশভাবে স্থখেন্দুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্থখেন্দু বাবু, তবে আপনি উঠুন।"

স্থখেন্দু বলিল, "আমি? আমার ত' তেমন গলা নেই।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, সে হবে না; আপনাকে গাইতেই হবে।"

স্থখেন্দু আরও দুচারবার আপত্তি জানাইল, কিন্তু বরেন্দ্রনাথ যখন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল।

হার্‌মোনিয়ামের চাবিগুলির উপরে একবার হাত চালাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থরে গিয়া থামিয়া স্থখেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাইব?"

হার্‌মোনিয়ামের স্থর শুনিয়াই বরেন্দ্রবাবুর তন্দ্রার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন, "রবিবাবুর একটা গান।"

বরেন্দ্রবাবুর তন্দ্রা আসিয়াছে, সরযূ এটা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই অদ্ভুত সঙ্গীতরসজ্ঞ অপূর্ব্ব শ্রোতাটির স্বভাব তাহার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সে জানিত, গান স্থরু করিতে না করিতেই তাহার স্বামী স্বপ্ন দেখিতে স্থরু করিবেন।

স্থখেন্দু গায়িল—

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি সরম লাগে তবে চাহিব না।

যদি তোমার ও নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে
আমার এ ভাঙ্গা তরী
বাহিব না—

সুখেন্দু গায়িতে লাগিল,—এ গান তার প্রথম যৌবনের প্রিয় গান! সে একদিন ছিল—যেদিন তাহারই মুখে এ গান সরযূ কতবার শুনিয়াছে! আজ আবার কতদিন—কতদিন পরে সেই শ্রোতার সামনেই এই যৌবনের গীতি তাহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল—তাই সুখেন্দুও প্রাণের সমস্ত আবেগ, সমস্ত ভাব দিয়া হৃদয়কে সুরে পরিণত করিয়া, স্থানকালপাত্র সমস্ত ভুলিয়া গায়িতে লাগিল। তাহার অতীত জীবনের শেষের দিক্‌টা যেন তাহার স্মৃতিপট হইতে একবারে মুছিয়া গিয়া জাগিয়া উঠিল,—সেদিনকার স্বপ্নচ্ছবি—যেদিন তাহার চিত্ত-মুরলীতে যৌবনের প্রথম উদ্বোধন-সঙ্গ ত ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, যেদিন ঐ মুক্ত-উদার বিপুল নীলিমার তলায় তাদের একান্ত-আপন ছোট্ট মানস-লোকে সে আর সরযূ—সরযূ আর সে ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না! হায় রে, সেদিন কি ভুলিবার?

সুখেন্দু আলোকের দিকে পিছন করিয়া একাগ্রমনে গান গায়িতেছিল। হঠাৎ হার্‌মোনিয়ামের উপরে পিছন হইতে কাহার ছায়া পড়িল! সেইসঙ্গে সে আপনার মস্তকে যেন কাহার তপ্ত শ্বাস অনুভব করিল! অত্যন্ত চমকিয়া মুখ ফিরিয়া সে দেখিল, শবের মত রক্তহীন মুখ লইয়া ঠিক্ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, সরযূ!

তাহার গান ও হর্‌মোনিয়ামের সুর একসঙ্গে সহসা থামিয়া গেল।

অতি অস্ফুট, কম্পিত, কাতর স্বরে সরযূ বলিল, "পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি—এ গান আর গেয়ো না।"

সুখেন্দু পাথরের মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। যখন ফিরিয়া চাহিল,—দেখিল, ঘরের ভিতরে সরযূ নাই এবং বরেন্দ্রবাবু 'অঘোরে' ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

৬

সুখেন্দু অনুতপ্ত চিত্তে যখন শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিল, তখন অনেক রাত।

তাহার প্রাণ তখন যাতনায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। আপনাকে সে আপনি প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, আপনার অজ্ঞাতসারে সে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। অপরাধ? কি অপরাধ? কি যে সে অপরাধ, সেটা সে ভাল করিয়া আন্দাজ করিতে পারিল না—সেটাকে সে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতরে ধরিতে পারিল না।

তবে এটা ঠিক্, সেই গানটা গাওয়া তার পক্ষে উচিত হয় নাই। একটা সামান্য গান যে এতটা অপকার করিতে পারে, সংসারের পনেরোআনা দৃষ্টিহীন লোক এ কথা মানিবে না। কিন্তু তার মত লোকের পক্ষে বোঝা উচিত ছিল যে, অবস্থাবিশেষে পূর্ব্ব-স্মৃতি-উদ্দীপক একটা সঙ্গীত বা একটা সামান্য ভঙ্গী পর্য্যন্ত মানুষের দুর্ব্বল চিত্তের ভিতর কত বড় ছেঁদা করিয়া দিতে পারে। খড়ের বোঝার ভিতরে একটা মস্ত মশাল ফেলিয়া দিলে যে কার্য্যসাধন

করে, একটুখানি আগুনের ফিন্‌কিও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম কাজ করে না।

তার চোখের সামনে আজ আর একটা সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! সরযূ এখনও তাকে ভুলিতে পারে নাই—সে এখনও তাকে ভালবাসে! হাঁ, নিশ্চয়ই। নহিলে পূর্ব্বকালের গান শুনিয়া সে অমনভাবে বিচলিত হইল কেন? যে মাটি নরম, সেই মাটিতেই পায়ের দাগ বসে,—শক্ত মাটিতে বসে না। তাহার প্রতি সরযূর যদি একটুও টান না থাকিত, তবে গান শুনিয়া তাহার মনে কোনরূপ বিকৃতি হইত না। আচ্ছা, সরযূ আমাকে গান গায়িতে মানা করিল কেন? বোধ হয় তাহার দুর্ব্বল মন আমার দিকে অন্যায়রূপে আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে সরাইয়া লইয়া যায়, সেই ভয়ে!

ছি ছি মনের আবেগে কি ভয়ানক ভুল করিতে বসিয়াছিলাম!

সে তাকে ভালবাসে! কিন্তু এ ভালবাসায় আজ আর তাহার কোন দাবী-দাওয়া নাই। সে যে পর-স্ত্রী! সরযূর কথা ভাবাও আজ তার পক্ষে অন্যায়।

সুখেন্দু এই ভয়ানক সত্যটা প্রাণপণে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্ধকারের ভিতরে জড়সড় হইয়া শুইয়া মনে মনে সে বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল, ইহা মিথ্যা, ইহা মিথ্যা! ঈশ্বর! আমাকে দয়া কর, আমার বুকে বল দাও, ইহা মিথ্যা করিয়া দাও! আমি ক্ষীণবল, হীন-প্রাণ—আমাকে এমন করিয়া পথে ফেলিয়া দিও না—আমাকে বাঁচাও প্রভু, বাঁচাও! ইহা মিথ্যা!

কিন্তু, সত্য কি কঠোর! সে যত অন্য কথা ভাবিয়া সেই ভীষণ

কথাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কথাটা ততই যেন বড় হইয়া, স্পষ্ট হইয়া তাহার মনের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য জোর করিতে লাগিল। সত্যটা ভয়ানক—কিন্তু, কিন্তু—কি মধুর! মনের ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া, আর কোন মানা না মানিয়া ক্রমাগত তাহাকে বলিতে লাগিল, সরযূ তাকে ভালবাসে, সরযূ তাকে ভালবাসে, সরযূ তাকে ভালবাসে!

মনের সঙ্গে যুঝিয়া যুঝিয়া আর সে পারিল না। পাগলের মত তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, ছুটিয়া গিয়া সে একটা জানালা খুলিয়া দিল। অমনি বাহির হইতে উদ্দাম বাতাস আসিয়া তাহার উন্মুক্ত বক্ষকে চারিদিক্ হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল—আঃ! কি স্নিগ্ধ, কি মধুর সে বাতাস!

অতি অস্পষ্ট চন্দ্রলেখায় সুদূরের শৈলমালা একটা ঘনীভূত বিরাট্ ছায়ার মত দেখাইতেছিল। সে যেন তার অন্ধকার হৃদয়ের বহির্বিকশিত প্রতিবিম্ব! চেয়ারের উপরে বসিয়া, জানালার কাঠের উপরে মাথা রাখিয়া সেইদিকে সে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল! আকাশে, কোথায় তখন একটা চাতক পাখী থামিয়া থামিয়া কাতরে ডাকিতেছিল—'ফটিক জল!' সেই তৃষিত কণ্ঠের করুণ কামনা শুনিতে শুনিতে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বিরামদায়িনী নিদ্রা আসিয়া কখন যে তার চোখের পাতা বন্ধ করিয়া দিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

চ

ডাক্তার মানুষের কপালে ঈশ্বর শান্তি লিখেন নাই। বরেন্দ্রবাবু

মধুপুরে আসিয়াছিলেন বিশ্রাম করিতে, কিন্তু কার্য্যগতিকে সেটা আর ঘটিয়া উঠিল না। এমনি প্রতিবারই হয়। লোকে ঠিক্ খোঁজ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। বিশেষ, মধুপুরে রোগীরও অভাব নাই। সুতরাং বরেন্দ্রনাথের বিশ্রাম করা আর হয় না।

পরদিন একটু বেলায় সুখেন্দুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বরেন্দ্রবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছেন। চাকর আসিয়া তাহাকে চা ও খাবার দিয়া গেল—কিন্তু সরযূকে দেখা গেল না।

সুখেন্দু চাকরকে সরযূর কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া থামিয়া গেল।

খানিক পরে বরেন্দ্রনাথ ফিরিলেন। সুখেন্দুকে একলা দেখিয়া তিনি একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন, "মাপ কর্ব্বেন সুখেন্দুবাবু! আপনাকে এক্লা রেখে ভারি কষ্ট দিয়েচি! ওর অসুখ করেচে, নৈলে এমনটা হত না!"

খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সুখেন্দু কহিল, "অসুখ! কি অসুখ?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়! ভারি মাথা ধরেচে, তাই বিছানা থেকে উঠতে পারচে না—বৈকালে একটু বেড়িয়ে এলেই সেরে যাবে অখন।"

সুখেন্দু বুঝিল অন্যরকম। আসল রোগটা যে মাথায় নয়, অন্য জায়গায় এ কথা সে মনে মনে অনেকটা আন্দাজ করিতে পারিল। আরও বুঝিল, সরযূ ইচ্ছা করিয়াই তাহার সুমুখে আসিতেছে না। পাছে আসিতে হয়, সেই ভয়েই সে অসুখের অছিলা করিয়াছে। এই কথা চিন্তা

করিয়া এবং এই অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া সরযূর উপরে সে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু একবারও তলাইয়া বুঝিল না যে, যাহার উপরে রাগ করিয়া দোষ দিতেছে, তাহার উপরে তার আর কোন দাবি-দাওয়া নাই! সে তার পরিচিত বটে,. কিন্তু সে আজ অপরের ধর্ম্মপত্নী।

বৈকালে বরেন্দ্রনাথ, সুখেন্দু ও সরযূকে সঙ্গে করিয়া নদীর দিকে চলিলেন। সরযূ সহজে বেড়াইতে যাইতে রাজি হয় নাই। বরেন্দ্রনাথ তাহাকে একরূপ জোর করিয়াই বাহিরে টানিয়া আনিলেন।

কিন্তু বাড়ীর বাহিরে পা দিতে না দিতেই একজন লোক আসিয়া হাজির। তাহার ভায়ের অসুখ বড় বাড়িয়াছে, ডাক্তারবাবুকে একবার যাইতেই হইবে।

বরেন্দ্রনাথ হতাশভাবে বলিলেন, "বটে, বটে, বটে! তা, তোমরা আমাকে জ্বালালে বাপু! আমাকে কি একটু হাঁফ ছাড়তেও দেবে না? দম আটকে মরে যাব যে বাবা!"

লোকটা লম্বা সেলাম ঠুকিয়া নিবেদন করিল যে, রোগীর ধারণা হইয়াছে, বরেন্দ্রবাবু 'ডাগ্ ডর্' তাহাকে 'দাওয়াই' না দিলে তাহার 'জান্' কিছুতেই বাঁচিবে না।

মনে মনে খুসী হইয়া বরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "রোগীদের বুদ্ধি-সুদ্ধি এতটা তীক্ষ্ণ হলে আমাকেও জান্ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে দেখছি। চল বাবা চল—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান্ ভানে, কল্‌কাতা ছাড়লেও রোগী ছাড়ে না!—সুখেন্দু বাবু, আপনি ওকে নিয়ে নদীর ধারে যান! শীগ্‌গীর ছাড়ান্ পাই যদি, তাহলে আমিও একটু পরে গিয়ে সঙ্গে যোগ দেব!"

সরযূ কহিল, "আজ তবে গিয়ে কাজ নেই।"

সুখেন্দুও বলিল, "সেই ভাল।"

কিন্তু বরেন্দ্রনাথ প্রবলভাবে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, "স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী সুখেন্দুবাবু! বেড়িয়ে এলে মাথার যাতনা সেরে যাবে! কিচ্ছু বোঝেন না, আবার বলা হচ্চে গিয়ে কাজ নেই! হুঃ—শেষটা ঘরে রোগী, বাইরে রোগী নিয়ে আমার হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা হোক্ আর কি!"

সরযূ কহিল, "আমার ব্যথা সেরে গেছে!"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভ্রম, মনের ভ্রম! ব্যথা ঠিক্ আছে, ঘরে গেলেই বাড়বে। আর, সেরেও গিয়ে থাকে যদি—সাবধানের মার নেই। যাও বেড়িয়ে এস।"

সরযূ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সুখেন্দু বুঝিল, তাহার সঙ্গে পাছে বেড়াইতে যাইতে হয়, সেই ভয়ই সরযূর এই অনিচ্ছার কারণ। এ কথাটা বোঝা অত্যন্ত সহজ; এবং বুঝিয়া অবধি তাহার বুকের মাঝে একটা যাতনা জাগিয়া তাহার সকল শান্তি নষ্ট করিয়া দিল। একদিন যে সরযূ একলহমা তাহাকে না দেখিলে কাঁদিয়া সারা হইত, একি সেই সরযূ! আশ্চর্য্য!

তখন দূরের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছিল। নীলিমার পেলব পটে কোন্ অদৃশ্য চিত্রকর রঙিন্ আলোর রং দিয়া বিচিত্র চিত্র আঁকিতেছিল, তাহার ছটায় সুদূরের বন-ভূমির নবীন শ্যামলতা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সাদা বকের ঝাঁক্ উড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কানন-রাণীর গলায় যেন বিনি-সূতায় গাঁথা বেল্‌ফুলের মালা দুলিতেছে।

দুধারের ধূধূ, অসমতল ময়দানের মাঝখানে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়া সুখেন্দু মুগ্ধনেত্রে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। একবার সরযূর মুখের দিকে তাকাইয়া সে কহিল, "আমরা সহরের ভেতরে প্রকৃতির এই আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকি। এ সব দৃশ্য কি সুধু দেখার জন্যে দেখা? তা ত নয়! এ সব দেখ্‌লে প্রাণের ভেতরে শান্তি আসে, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায়, মানুষ বুঝ্‌তে পারে যে এই সুন্দর বিশ্বে সে সুধু টাকা-আনা পয়সার হিসেব করতে জন্মায়নি। বাস্তবিক, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাদের যে শিক্ষা দিতে পারে, হাজার হাজার পুঁথি তা পারে না।"

সুখেন্দু আপন মনে গড়্‌গড়্ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল, সরযূ শুনিতেছে কি শুনিতেছে না, সে খেয়াল্ তাহার মোটেই ছিল না; বলিতে বলিতে হঠাৎ সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, মাথা হেঁট করিয়া সরযূ নীরবে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। সুখেন্দুর একটা কথাও সে শুনিতে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ!

সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "সরযূ, তোমার কি ভাল লাগচে না?

"না।"

"তোমার কি অসুখ করেচে?"

"না।"

"তবে?"

"জানি না।"

তাহার এই একান্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে ও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ভাবে সুখেন্দু আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিল। কেন, তাহার কি দোষ? সুখেন্দু স্বভাবতঃ অভিমানী ও ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক। এই

প্রকৃতির লোকেরা, কোমলপ্রাণ হইলেও অতি তুচ্ছ একটা কথাতেও অত্যন্ত বেশীরকম আঘাত পায়। তাহাদের কোমলতাই, তাহাদের দুর্ব্বলতা। সুখেন্দু, সরযূকে কি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিল।

ততক্ষণে তাহারা নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। বৎসরের অন্য সময়ে এই নদীর দুধারে মানব এবং নানা পশু-পক্ষীর পদচিহ্ন বক্ষে লইয়া, যে দীর্ঘ বালুকাধবল তট, শীর্ণ কঙ্কালের মত পড়িয়া থাকে, আজ বর্ষাকালে অজস্র-বৃষ্টি জলধারায় পরিপুষ্ট হইয়া সে কঙ্কাল একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

সরযূ বলিল, "বেড়ান ত' হ'ল—এখন চল।"

সরযূ অত্যন্ত নীরস স্বরে কথাগুলি বলিল; যেন সুখেন্দুই তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া আনিয়াছে! একান্ত ক্রোধে সুখেন্দুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল —সে আর সহ্য করিতে পারিল না। ডাকিল,—

"সরযূ!"

তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া সরযূ চোখ তুলিয়া চাহিল; চাহিয়াই আবার দৃষ্টি নত করিল।

সুখেন্দু তিক্তস্বরে বলিল, "সরযূ, তোমার কাছে আমি কি দোষ করেচি যে, তুমি কথায় কথায় আমাকে এতটা উপেক্ষা কর্‌চ?"

সরযূর দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

সুখেন্দু তীব্রস্বরে বলিল, "আমি এসে পর্য্যন্ত দেখচি, তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইচ না, আমার সামনে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে

পালিয়ে বেড়াচ্চ, আমার সঙ্গে যে আগে তোমার পরিচয় ছিল,—সেটা বলতেও যেন তুমি লজ্জা পাও—আমি যেন একটা আপদের মত তোমাদের ঘাড়ে এসে পড়েচি—যেন আমি চলে গেলেই তুমি বাঁচ—"

হঠাৎ বাধা দিয়া সরযূ বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি চলে যাও—তুমি চলে যাও! তাহলে আমি বাঁচি!"

সহসা একটা উচ্চস্থান হইতে কোন মানুষকে ধাক্কা মারিলে তাহার মুখ মুহূর্ত্তে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, সুখেন্দুর মুখের ভাবটাও ঠিক তেমনি হইল। সে নির্ব্বাক্ হইয়া দুইহস্তে আপনার অপমান ও বেদন-কাতর বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তটিনীর উপলাহত চঞ্চল স্রোতের দিকে পলক-হারা চোখে চাহিয়া রহিল। সরযূও একটা ক্ষুদ্র শৈলের উপরে একান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। তাহার শ্বাস যেন তখন বন্ধ হইয়া আসিতেছে! সুখেন্দুকে এত বড় একটা কঠিন কথা বলা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না—ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় এমন একটা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়াতে অনুতাপে এখন তাহার অন্তর যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। বিশেষ, সুখেন্দু যদি তাহার অপরিচিত হইত, তবে তাহার মুখ হইতে হয়ত এমন কথা বাহির হইতে পারিত না। সুখেন্দুকে বাল্যকালে সে এমন কর্কশ কথা কতবার বলিয়াছে,—কিন্তু সুখেন্দু, তখন তাহার ক্রোধ বা বিরক্তি, গ্রাহ্যের ভিতরেই আনিত না! কিন্তু, আজত' আর সেদিন নাই!

বহুক্ষণ পরে প্রথমেই সুখেন্দু কথা কহিল। ধীরে ধীরে বলিল, "চোখের আড়াল হলেই মানুষ মানুষকে ভুলে যায় —দুনিয়ার গতিক এই। কিন্তু অকারণে, বিনাদোষে মানুষ যে মানুষকে এমনভাবে অপমান করতে

পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমি ত' তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম সরযু! তবে, কেন তুমি আমাকে ডেকে এনে আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালে? আপনাকে নিয়ে আমি আপনিত' বেশ ছিলাম, তুমি না ডাক্‌লে আমিত' আস্‌তাম না—ডেকে এনে একি ব্যবহার? সরযু, সরযু, এ কোন্ দেশের অতিথি-সৎকার?"

সরযূ কাঁপিতে কাঁপিতে সুখেন্দুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিল, "মাপ কর! আমার অবস্থা যদি বুঝ্‌তে!—"

চারিদিক্ হইতে কিসের একটা শব্দ উঠিল। দুইজনেই অত্যন্ত চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, আকাশ মেঘে মেঘে মেঘময় এবং সেই নিকষ-কালো জলদ-পটে রহিয়া রহিয়া বিজলী, আগুনের ক্ষণিক আখর লিখিয়া দিতেছে! নিবিড় ধূলারাশির ভিতরে উচ্চ তরু-শিরগুলা দুলিয়া দুলিয়া মাতালের মত নত হইয়া পড়িতেছে—এবং ঝোড়ো বাতাস গর্জ্জিয়া উঠিয়া হু-হু-হু-হু ছুটিয়া আসিতেছে!

আপনাদের মনের আবেগে সুখেন্দু ও সরযূ এমনি বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়াছিল যে, প্রকৃতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য বা অনুভব করিবার অবকাশ তাহাদের মোটেই হয় নাই!

জ

সুখেন্দু তাড়াতাড়ি, "সরযু—ওঠ—ওঠ! ঝড় এল বলে! শীঘ্র চল!"

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু ততক্ষণে ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে—তেমন ঝড় তারা বহুকাল

দেখে নাই। বালুকণাপূর্ণ ধূলায় ধূলায় তাহাদের চোখ-কাণ ভরিয়া গেল, হাওয়ার দাপটে তাহাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল! মুক্ত প্রান্তরে ঝড়ের মুখে পড়িলে অবস্থা যে কিরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহা যিনি জানেন না, তিনি বুঝিবেনও না। চারিদিকে কি অন্ধকার! আর সেই আঁধারের ভিতর হইতে রাশি রাশি কাঠকুটা আসিয়া তাহাদের গায়ে তীক্ষ্ণ সূচের মত বিঁধতে লাগিল।

সুখেন্দু চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সরযূ!"

কিন্তু তাহার চীৎকার ঝড়ের চীৎকারে মিশিয়া গেল, সরযূ শুনিতে পাইল না।

সুখেন্দু অন্ধের মত হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সরযূর একখানা হাত চাপিয়া ধরিল—বিদ্যুৎ-বিভায় কোনক্রমে পথ দেখিয়া দেখিয়া এবং কতবার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া অনেক কষ্টে অগ্রসর হইয়া তাহারা একটি আশ্রয় পাইল। সেখানে একটি অতিক্ষুদ্র পাহাড় বা পাষাণীভূতা ভূমি ঝটিকার ভিতরে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সুখেন্দু ও সরযূ তাহার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ের শীর্ষভাগটা সামনের দিকে বেঁকিয়া অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়াতে, তাহাদের মাথার উপরে বেশ একটা আচ্ছাদানের মত হইল।

তাহারই তলায় শ্রান্তভাবে বসিয়া বসিয়া তাহারা দুজনে হাঁফাইতে লাগিল।

যে যায়গাটায় তাহারা আসিয়াছিল, সে যায়গাটাও অন্যস্থান হইতে অনেকটা উন্নত। সেইখান হইতে তাহারা নীরবে—বিস্মিত নেত্রে দেখিতে লাগিল, অবিরত বিদ্যুৎ-বিকাশে সুমুখের বিশাল প্রান্তর, বুকের

উপরে কল্লোলিনী তটিনীর শুভ্র-রেখা এবং টলটল বৃক্ষমালার রুদ্র নটন-লীলা লইয়া রহিয়া রহিয়া মায়া-দৃশ্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! ক্ষুব্ধ ঝটিকা তখনও একটা বিশ্বব্যাপী হাহাকারের মত ফাটিয়া ফাটিয়া মরিতেছিল এবং তাহারই মূর্ত্তিমান্ গতির মত দূরে একখানা 'মেলট্রেণ' আপনার অগ্নিময় রক্তচক্ষু মেলিয়া কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, কার্ম্মুকমুক্ত শরবৎ হু-হু-বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুখেন্দু কহিল, "এখন বাড়ী যাওয়ার কি হবে?"

সরযূ কহিল, "তিনি কি ভাব্‌চেন, জানিনা!"

এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপ্লবে, তাহারা আপনাদের মানসিক বিপ্লব ভুলিয়া গিয়াছিল; এখন সুখেন্দুর মনে আবার সেই কথার উদয় হইল। সরযূর সেই রুক্ষ ও কঠিন ভাষা এবং ক্ষণপরেই তাহার সেই কাতর ক্ষমাপ্রার্থনা, এ সকলই তাহার মনে পড়িল। এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, এই অসহায়া রমণীর প্রাণের ভিতরে কিরূপ বিপরীত দুই ভাবের ধারা পাশাপাশি বহিয়া যাইতেছে! একদিক্ হইতে তাহার বিবেক-বুদ্ধি উপায়ান্তর অভাবে তাহাকে যেমন কঠিন ও সাবধান করিয়া তুলিতেছে,—অন্যদিকে তেমনই তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বল ও কোমল বৃত্তিগুলি তাহাকে অভিভূত করিয়া, তাহার মাথা নত করিয়া দিতে চাহিতেছে। সে সাধারণ স্ত্রীলোক নয় বলিয়াই, যেমনভাবে সমুদ্র-তরঙ্গের রুদ্র নৃত্য-রঙ্গের মুখে অচল শৈল সমান দাঁড়াইয়া থাকে, তেমন ভাবেই এখনও বৃত্তির এই প্রভুত্বকে অবহেলা করিয়া নিজে শক্ত হইয়া আছে। শক্ত না হইলেত' তার আর কোন উপায় নাই! সুখেন্দু আপন মনে যতই এই কথাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল, পাশের সেই

স্বল্পভাষিণী সঙ্গিনীটির উদ্দেশে তাহার প্রাণমন ততই ভক্তি ও সম্মানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

অকস্মাৎ অতি নিকটেই একটি বৃক্ষ-চূড়া বজ্রের ভৈরব হৃদয়-স্তম্ভন হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—এবং সেই তীব্র শিখার অসহ উত্তাপ যেন সরযূর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দিয়া গেল; ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত সরযূ দুই চক্ষু মুদিয়া দুইহাতে প্রাণপণে সুখেন্দুর বাহুমূল আকড়িয়া ধরিল এবং তাহার মস্তক, সুখেন্দুর স্কন্ধের উপরে বলহীন হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

বজ্রপাতে সুখেন্দুর প্রাণও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল যে, সরযূ ভয় পাইয়াছে, তখন নিজের কথা সে ভুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "সরযূ, ভয় কর্‌চে?"

কিন্তু সরযূ কোন কথা কহিতে পারিল না। বজ্ররোলে তাহার সর্ব্বশরীরে কেমন একটা মূঢ়তা আসিয়াছিল। সুখেন্দুর কণ্ঠস্বরে সে আরও জোরে তাহার বাহু চাপিয়া ধরিল। সেই গভীর আত্মসমর্পণের ভারে সুখেন্দুর মন কেমন একটা অজ্ঞাত পুলকে ভরিয়া গেল এবং স্কন্ধের উপরে সরযূর এক একটি তপ্তশ্বাস অনুভব করিয়া তাহার মনে হইল, যেন জীবনের উপর দিয়া বসন্তের এক একটি উত্তপ্ত সমীরোচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছে!

তখন ঝড় অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে এবং বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে।

সুখেন্দুর স্মরণ হইল, ছেলেবেলায় সে ও সরযূ যখন এক বিছানায় দুজনে শুইয়া থাকিত, তখন এমনি দুর্য্যোগময়ী রজনীতে, বজ্রনিনাদে সরযূ এমনি করিয়াই চমকিয়া সভয়ে তাহাকে জড়াইয়া ধরিত।

সুখেন্দু ধীরে ধীরে বলিল "সরযূ, আবার কি আমাদের ছেলেবেলা ফিরে এসেচে ?"

সরযূ নীরব। কিন্তু সুখেন্দু বুঝিতে পারিল, তাহার দেহ তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! বাতাসে সরযূর মাথার 'এলমেল' চুলগুলি সুখেন্দুর কণ্ঠে ও গণ্ডে উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল।

সুখেন্দু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "বাল্যের স্মৃতি কি মধুর!"

সরযূ এবারও কথা কহিল না! হঠাৎ সুখেন্দুর কণ্ঠে একফোঁটা জল পড়িল। প্রথমে সে ভাবিল, তাহা বৃষ্টির জল। কিন্তু তারা যেখানে বসিয়াছিল, সেখানেত' বৃষ্টি পড়িতেছিল না! আর বৃষ্টির জল কি এত উষ্ণ? আবার, আর এক বিন্দু!

সুখেন্দু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সরযূ! তুমি কাঁদ্চ!"

সরযূ এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলিল। সুখেন্দুর বাহু ছাড়িয়া দিয়া কাতর, মৃদুস্বরে বলিল, "ভাই, আমাকে দয়া কর!"

সুখেন্দু আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি বল্চ, সরযূ?"

সরযূ তেমনি সকাতরে বলিল, "আমাকে দয়া কর ভাই, আমাকে দয়া কর! আমার সংসার উচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তুমি দয়া না কর্লে আমি মর্ব।"

এইবার সুখেন্দু বুঝিল। তাহার মাথা বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সরযূও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহির হইতে তখন মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস জলের ছাট্‌ মাখিয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিতেছিল।

সরযূ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমার অবস্থা একবার ভেবে

দেখ। আমি তোমাকে ইচ্ছে করে অবহেলা করি নি, আমি তোমাকে আগে ভালবাস্‌তুম—এখন ভয় করি। তোমার কোন দোষ নেই, তুমি বিদ্বান, তুমি চরিত্রবান্! কিন্তু আমার মনকে ত' বিশ্বাস করা যায় না সুখেন্দু! আমি সামান্য স্ত্রীলোক, অন্যের পত্নী—আমি যদি সাবধান না হই ভাই, তাহলে ঈশ্বরের কাছে কি বলে জবাব দেব? তাই জোর ক'রে আমি তোমার ওপরে কঠোর হয়েচি! কিন্তু, তুমি আমার সাম্‌নে থাকলে আমি সমস্তকথা ভুলে যাই, আমি আপনাকে আর সাম্‌লে রাখতে পারি না! এই দেখ, একটু আগে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, আমি যে-রকম নির্লজ্জের মত তোমার কাঁধে মাথা রেখে পড়েছিলুম,—তাতে—তাতে—" বলিতে বলিতে সরযূ আর কথা শেষ করিতে পারিল না—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—তাহার পর সেই অন্ধকারে দুই হাতে হঠাৎ সুখেন্দুর পা চাপিয়া ধরিয়া তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমাকে দয়া কর—ওগো, আমাকে দয়া কর!"

সুখেন্দু পা সরাইয়া লইতে পারিল না—কাঠ হইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল! তাহার দুই পদ সরযূর অশ্রুপাতে সিক্ত হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সেই অশ্রুর প্রতি বিন্দু যেন দ্রবীভূত অগ্নিপিণ্ডের এক-একটি জ্বলন্ত ফোঁটা!

সহসা দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—যেন কাহারা গোলমাল করিতে করিতে আসিতেছে! চমকিত হইয়া সুখেন্দু সেইদিকে প্রেতভয়-গ্রস্তের মত চাহিয়া দেখিল—তাইত! গাছের পাতার ফাঁক দিয়া অনেক-গুলা জ্বলন্ত আলো দেখা যাইতেছে!

আলো ক্রমে নিকটে আসিল। পরিচিত কণ্ঠে একজন চীৎকার

করিয়া ডাকিল, "সুখেন্দুবাবু! সুখেন্দুবাবু! সুখেন্দুবাবু!"

সুখেন্দু একলাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সরযূ, প্রকৃতিস্থ হও! তোমার স্বামী আমাদের খোঁজে বেরিয়েচেন। চোখের জল মোছ,—তিনি যেন কিছু দেখতে না পান! আর—আর,—তোমার কথার উত্তর কাল পাবে! জেন, আমি পাপিষ্ঠ নই।"

বরেন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন। এবার সুখেন্দু বাহিরে আসিয়া সাড়া দিল।

ঝ

বরেন্দ্রনাথের রাত জাগিয়া পড়ার বাতিক ছিল। নহিলে তাঁহার ঘুম হইত না।

ঝড়ের রাতে ফিরিয়া আসিয়া সরযূ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে; বরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ যেমন বই পড়িয়া থাকেন, সেদিনও তেমনি টেবিলের ধারে বসিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত একখানা ইংরাজী নভেল পাঠ করিলেন। ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল, তিনিও বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি শয়ন করিবার আগেই সরযূ প্রতিদিন ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু সেদিন খাটের কাছে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সরযূ তখনও ঘুমায় নাই—কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বিছানার উপরে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে।

বরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি আশ্চয্যি ব্যাপার—অ্যাঁ! বিছানা ছুঁতে না ছুঁতে যে মানুষ ঘুমিয়ে কাদা—তাঁর চোখে আজ ঘুম নেই, এও কি সম্ভব?"

সরযূ ম্লানভাবে বরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। তাহার মুখের ভাব

দেখিয়া বরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাথার অসুখটা বুঝি বেড়েচে? ওষুধ দেব?"

"না!"

সরযূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বরেন্দ্রনাথের উদ্বেগ বাড়িল বৈ কমিল না। বলিলেন, "তোমার গলা এমন ধরা-ধরা কেন? জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেচে বুঝি? কি মুস্কিল! জ্বর-টর্ হয়নি ত? দেখি, হাত দেখি!"

সরযূ বলিল, "আমার কিচ্ছু হয়নি।"

কিন্তু বরেন্দ্রনাথ সে কথা শুনিলেন না, একান্ত অবিশ্বাসের সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ওকথা বাজে কথা—একটা কিছু হয়েচে!"

সরযূ সহসা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দুইহাত দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

সরযূর ব্যবহারে বরেন্দ্রনাথ আজ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সে ত' এমনধারা কখন করে না! তিনি সরযূর মাথায় সপ্রেমে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "সরযূ, তোমার কি হয়েচে আমাকে বলবে না?"

সরযূ কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ বরেন্দ্রনাথের মনে হইল, তাঁহার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া সরযূ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাড়াতাড়ি তিনি দুইহাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন! সত্যই ত'! সরযূর চোখে জল!

বরেন্দ্রনাথ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দুইহাতে তেমনি করিয়া সরযূর মুখখানি ধরিয়া থাকিয়া তিনি আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সরযূকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিবাহ হইয়া অবধি

তাহার চোখে তিনি কখনও জল দেখেন নাই। আজ এই প্রথম সরযূকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহারও মুখ কাঁদ-কাঁদ হইয়া আসিল!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাকে কি কেউ কিছু বলেচে?"

"না।"

"তবে?"

"বল্‌ব?"

"বল—বল! তোমার এমন কি হয়েচে যে, তুমি একেবারে কেঁদে ফেল্লে?"

"বল্‌চি। বল্‌ব বলেই এতক্ষণ জেগে আছি। তোমাকে সব না খুলে বল্‌তে পার্‌লে প্রাণে আমার শান্তি হবে না। কিন্তু বলি-বলি করে আর বল্‌তে পার্‌চি না, বড় ভয় কর্‌চে!"

"ভয়? আমাকে ভয়? বলকি সরযূ?"

"হ্যাঁ। পাছে শুনে তুমি আমাকে কি মনে কর, আমাকে পায়ে ঠেল।"

বরেন্দ্রনাথ অতি করুণভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যে সরযূর ভয় হইতে পারে, এ কথাটা তিনি যতই ভাবেন, ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে লাগিলেন।

সরযূ ভয়ে-ভয়ে স্বামীর একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "বল, আমাকে বক্‌বে না?"

"ও সব বকা-টকা আমার কুষ্টিতে লেখে না। যা বল্‌তে চাও বল, না বল্‌তে চাও বোলো না। ব্যাস্—ফুরিয়া গেল। এর ভেতরে আবার কিন্তু কি?"—বলিয়া, বরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধস্বগতভাবে আবার অস্ফুট

স্বরে কহিলেন, "অ্যাঁ! স্বামীর কাছে ভয়—অ্যাঁ! এযে অবাক্ কাণ্ড!"

সরযূ তখন বুক বাঁধিয়া স্বামীর দৃষ্টিতে আপনার দৃষ্টি মিলাইয়া তাঁহার সামনে সোজা হইয়া বসিল। তারপর পরিষ্কার, সতেজ কণ্ঠে, এখানে সুখেন্দুর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যকার ঘটনা পর্য্যন্ত সমস্ত বলিয়া গেল,—একটা সামান্য কথা ভুলিয়া গেল না, লজ্জাবশত কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিল না।

এই কথাগুলা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ বুকের ভিতরে ব্যাকুল ও উন্মুখ হইয়া ছিল—কে-যেন তার কাণে কাণে ক্রমাগত বলিতেছিল, 'তোমার মন চঞ্চল হইয়াছে, তুমি স্বামীর সঙ্গে লুকাচুরি করিতেছ, তুমি অবিশ্বাসিনী!' তাই যতক্ষণ সমস্ত ঘটনা, সমস্ত হৃদয়-বিপ্লব আপনার সমস্ত চাঞ্চল্য ও গুপ্তকথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা না চাহিবে, ততক্ষণ যে তাহার অশান্ত প্রাণ শান্ত হইবে না, এটা সে স্থির বুঝিয়াছিল।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে বরেন্দ্রনাথ একবার মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করেন, একবার কাঁচুমাচু মুখ করিয়া কড়িকাঠ বা দেওয়াল বা মেঝের দিকে চাহিয়া থাকেন, তাঁহার ভাবখানা দেখিলে মনে হয়,—সরযূর এই গোপনীয় আত্মকাহিনী শোনা,—তিনি যেন অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ করিতেছেন।

সরযূ তাহার কথা শেষ করিল। বরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সরযূ কাতরভাবে বলিল, "বল, আমার সব দোষ মাপ করিলে?"

বরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সরযূর দুই স্কন্ধের উপরে আপনার দুই হাত রাখিলেন। তাহার পর পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার সজল চোখের দিকে চাহিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন, "সরযূ! কোন স্ত্রীলোক যদি এমনভাবে আপনার দুর্ব্বলতাকে দমন করতে পারে, তাহলে তাকে দোষী মনে করা উচিত, না তার প্রশংসা করা উচিত, এ কথাটা তুমিই বল!"

সরযূ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার বুকের উপর হইতে যেন একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

এও

পরদিন ভোরবেলা বরেন্দ্রনাথ শুনিলেন, সুখেন্দুবাবু আজ কলিকাতায় ফিরিবেন।

তিনি তখনই সুখেন্দুর কাছে ছুটিয়া গেলেন। বলিলেন, "হাঁ সুখেন্দুবাবু, আপনি নাকি কল্‌কাতায় পালাতে চান?"

সুখেন্দু বলিল, "পালাতে চাইনা, যেতে চাই।"

"উহু—সেটি হবে না! আমরা ছেড়ে দিলে তবে ত যাবেন? আমি আপনার হাত ধরে থাকবো, আর লতাকে শিখিয়ে দেব—সে আপনার গোঁফ ধরে থাকবে, দেখি, কেমন করে যান আপনি!"

সুখেন্দু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে মাপ কর্ব্বেন বরেন্দ্রবাবু! আমি আর কোনমতেই থাকতে পার্ব্ব না। আপনি হাত ধরলেও না, লতা গোঁফ ধরলেও না! ভাববেন না, আপনার এখানে আমার কিছু কষ্ট হয়েচে বলে আমি চলে যাচ্ছি! সত্যিকথা বলচি, আপনাদের কাছে রাজার হালে ছিলুম। কিন্তু না গেলে নয়, তাই যেতে হলো।"

সুখেন্দু এমন দৃঢ়স্বরে কথাগুলি বলিল যে, বরেন্দ্রনাথ নেহাৎ হতাশ হইয়া ঘাড়নাড়া ভিন্ন আর কি করিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। বরেন্দ্রনাথ যখন চলিয়া গেলেন, সুখেন্দু শুনিল, তিনি চিন্তিতভাবে আপনা-আপনি বলিতে বলিতে যাইতেছেন, "বটে, বটে, বটে! এরা সব দেবতা!"

বরেন্দ্রনাথের এ কথাগুলির মানে কি? সুখেন্দু অনেকক্ষণ ভাবিল, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

*　　*　　*　　*　　*

সেদিন সুখেন্দু লক্ষ্য করিল, সরযূর দৃষ্টি একটু লজ্জিত বটে, কিন্তু তাহার ভাব-ভঙ্গীতে আগেকার মত সঙ্কোচ বা জড়সড় ভাব আর নাই। সুখেন্দু ভাবিল, সে বিদায় হইতেছে, সেই আনন্দে সরযূর সঙ্কোচও দূর হইয়াছে। মনে-মনে সে একটু দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইল।

কিন্তু, সুখেন্দু ভুল বুঝিয়াছে। সরযূর যত সঙ্কোচ, যত ভয় কাল রাত্রিতেই দূর হইয়াছে। পতির সুমুখে যখন সে মনের দরজা খুলিয়া দিতে পারিয়াছে, তখন হইতেই সে আবার একজন নূতন মানুষ।

যাইবার সময়ে সে বাংলোর সামনের বাগানে সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূ তখন গোলাপের গাছ হইতে ফুল তুলিতেছিল।

সুখেন্দু বলিল, "তোমার পথ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় হলাম সরযূ! তুমি সুখে থাক—আর আমি আস্‌ব না। কাল তোমার কথার উত্তর দেব বলেছিলাম, এই আমার উত্তর।"

সকলের চেয়ে বড় গোলাপটি সরযূ এইমাত্র তুলিয়াছিল। সুখেন্দুর কথা শুনিবামাত্র তাহার হাত হইতে খসিয়া, ফুলটি নীচের নরম ঘাসের

উপরে পড়িয়া গেল। সে কি বলিতে গেল, পারিল না। অত্যন্ত বিবর্ণ. মুখে শূন্যদৃষ্টিতে সে মেঘের মত ধূসর সুদূর শৈলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুখেন্দু চলিয়া গেল। বহুদূর গিয়া আর একবার সে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, সরযূ ঠিক তেমনি করিয়াই পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া নিশ্চল প্রতিমার মত সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তারপরে পথের বাঁক্ আসিয়া সে দৃশ্যের উপরে চিরদিনের জন্য যবনিকা টানিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে সরযূ প্রকৃতিস্থ হইল। যে বড় ফুলটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেটিকে ফের্ কুড়াইয়া লইবার জন্য সে নীচের দিকে চাহিল ; কিন্তু ফুল নাই।

সরযূ অনেক খুঁজিল, পাইল না!

কপোতী

ক

আলিসার তলায়, একটি কুলুঙ্গীর ভিতরে দুটি পায়রা বাসা বাঁধিয়াছিল। তারা কোথা হইতে আসিয়াছিল,—তা জানি না। আমরা যাহাদিগকে 'গোলা পায়রা' বলি, এ দুটি সেই জাতের। তাদের গায়ের রং নিকষের মত, গলার রং রামধনুর মত, পায়ের রং লাল দোপাটি ফুলের মত!

তাহাদের ঠিক সাম্‌নে আমার পড়িবার ঘর। যখন বই পড়িতাম, তখন তাহাদের মৃদুগুঞ্জন কাণে আসিয়া বাজিত। বই হইতে মুখ তুলিলেই দেখিতাম, তাহারা দুটিতে পাশাপাশি বসিয়া আছে।

আমি তাদের ভালবাসিতাম;—তারাও আমাকে ভালবাসিত। তাদের জন্য রোজ আমি একটি চুব্‌ড়ী ভরিয়া খাবার রাখিতাম। মাঝে মাঝে খাবারগুলি ছড়াইয়া দিতাম; আর তারা উড়িয়া আসিয়া আমার সাম্‌নে বসিয়া খাবারগুলি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খাইত। একদিন খাবার দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া আছি,—

হঠাৎ বাহির হইতে দরজার উপরে আঘাত হইতে লাগিল—অতি মৃদু-মৃদু আঘাত। দরজা খুলিয়া দেখি,—আমার পায়রা! আমাকে দেখিয়াই তাদের একটি মাথা নাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে 'বক্-বক্-বকম্' করিয়া আমাকে বকিতে সুরু করিয়া দিল এবং অন্যটি ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা যেন বলিতে চায়, "বেড়ে লোক ত' হে! আমরা এখানে না খেয়ে উপোস ক'রে মর্‌ছি, আর তুমি কিনা দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছ! বেশ মানুষ যা হোক!"

সেইদিন হইতে আমি তাদের ঠিক নিয়মমত খাবার দিতাম।

তারা কিন্তু আমার চেয়ে আমার স্ত্রীকে বেশী ভালবাসিত। বিকালে, হাতে যখন কোন কাজ থাকিত না—তাদের সঙ্গে আমার স্ত্রী খেলা করিত। সে হাততালি দিয়া তাহাদিগকে ডাকিত,—করতালির তালে তালে আহত কঙ্কণ-বলয় রিণি-রিণি কাঁদিয়া উঠিত এবং সেইসঙ্গে পায়রা দুটি স্ত্রীর কাঁধে বা বাহুর উপরে আসিয়া বসিত। প্রিয়া আস্তে আস্তে আপনার নরম আঙ্গুলের গোলাপী নখ দিয়া তাদের ছোট ছোট মাথা চুলকাইয়া দিত, তাদের কোমল বুকে, কোমল পিঠে আদরমাখা চুম দিত, আর সেই পুষ্পপেলব অধরের মায়াস্পর্শে কপোতদুটির অবশ দেহ আরামে এলাইয়া পড়িত,—তাদের রাঙ্গা-রাঙ্গা চোখদুটি আলসে ঢুলিয়া পড়িত।

জানালায় মুখ বাড়াইয়া আমি বলিতাম, "প্রিয়ে, আমার পাওনা অন্যকে দিও না,—তোমার চুম্বনের মালিক আমি!"

চকিত গ্রীবা-ভঙ্গীতে আমার দিকে ফিরিয়া সে একটি লজ্জাললিত মধুর কটাক্ষ করিত।

পায়রাছুটি পরস্পরকে বড় ভালবাসিত। অমন ভালবাসা বুঝি মানুষের ভিতরেও দেখা যায় না। তাদের দিকে চাহিলেই দেখিতাম, তারা দুজনে দুজনকে আদর করিতেছে। কখনও কপোতী, কপোতের রঙ্গিণ বুকে আপনার ছোট মাথাটি বুলাইয়া দেয়; আবার কখনও কপোত সপ্রেমে ঊর্দ্ধমুখী কপোতীর চঞ্চুচুম্বন করে। চঞ্চুচুম্বনের অবকাশে মাঝে মাঝে তারা চকিত দৃষ্টিতে মাথা ঘুরাইয়া চারিদিক্‌টা এক-একবার দেখিয়া লইত। তারা যেন ঠিক দুটি নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা—অন্যে দেখিতে পাইলে বড় লজ্জা! তাহাদের একটি বাহিরে গেলে অন্যটি ব্যাকুলভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত।

এক-একদিন কপোত বাহিরে গেলে, অন্য কোন কপোত আসিয়া হাজির হইত। আসিয়া, সগর্ব্বে পা ফেলিয়া, চক্র দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গলা ফুলাইয়া কূজন করিতে করিতে কপোতীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইত যে,—সে চলিতে জানে, নাচিতে জানে, গায়িতে জানে! কপোতী কিছু বলিত না,—আপনার বাসার সামনেটিতে বুকে ভর্ দিয়া বসিয়া বসিয়া, নীরবে ত্রস্ত চোখে আগন্তুকের 'রকম-সকম' নিরীক্ষণ করিত।

কপোতীর দিক্ হইতে সাড়া না পাইয়া আগন্তুক হঠাৎ নাচ বন্ধ করিয়া বাসার ভিতরে গিয়া বসিত। কপোতী ভয় পাইয়া আরও ভিতরে সরিয়া যাইত—আগন্তুককে ঠুক্‌রাইয়া দিত। এমন অভ্যর্থনা যুৎসই নয় ভাবিয়া কোনদিন আগন্তুক আপনিই সরিয়া পড়িত, আবার কোনও দিন-বা আমার স্ত্রী "হতভাগা পায়রা, রোস্ ত'" বলিয়া, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

খ

যেখানে মেঘ-মেদুর আকাশের কোলে শ্যামলঘন বনভূমির উপরে বিজলীর হীরক-হার দুলিতেছিল, সেইদিকে নিরাশনেত্রে চাহিয়া কপোতী স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল।

আজ তিনদিন হইল কপোত বাহির হইয়া গিয়াছে, আর ফিরে নাই।

মাঝে মাঝে কপোতী বাহির হইয়া আসিতেছে, একবার এদিকে, একবার ওদিকে উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কপোতের দেখা নাই। আকাশে আগুন ধরাইয়া হঠাৎ বাজ্ ডাকিয়া ওঠে, আর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কপোতী বাসায় ফিরিয়া আসে। এমনিভাবে তিনদিন কাটিয়াছে।

আমি কপোতীকে কতবার ডাকিয়াছি, কতবার খাবার ছড়াইয়া দিয়াছি,—কিন্তু সে আমার কথা কাণে তোলে নাই, খাবারের দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। হয়ত ক্ষুধায় তাহার দেহ জরজর,—কিন্তু শোকে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়াছে।

*   *   *   *

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া বাহির হইতে দরজা-জানালায় ধাক্কা মারিতেছিল। এবং ঝুপঝাপ করিয়া অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছিল।

চাহিয়া দেখি, আমার স্ত্রীও উঠিয়া বসিয়াছে। সে যেন বসিয়া বসিয়া

একমনে কি শুনিতেছিল। আমাকে জাগতে দেখিয়া সে, মৃদু কাতর স্বরে বলিল, "আহা, শোন!"

"কি, বৃষ্টি পড়্ছে—?"

"না। আর কিছু শুন্‌তে পাচ্ছ না?"

আমি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। তাইত! বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ মাঝে মাঝে থামিয়া পড়িতেছে, আর সেইসঙ্গে কোন আর্ত্ত কপোতের অতি করুণ, অতি অস্ফুট ক্রন্দন রহিয়া রহিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বুঝিলাম, বরষা-রাতে, বজ্রের এই কঠোর অট্টহাস্যে, বৃষ্টির এই হিম-শীতল ঝাপটায়, ঝড়ের এই বিষম দাপটে, নীড়ের ভিতরে দোসর-হারা হইয়া বিনিদ্র কপোতী আপন প্রিয়ের বিরহে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মরিতেছে! আজ আর প্রিয়ের প্রেমতপ্ত পক্ষপুট নাই, আজ আর তাহার ভয়কম্পিত তনুকে ঢাকিয়া রাখিবার কোন আবরণ নাই,—আজ সে একাকী!—আহা, বড় একাকী! কেন জানি না, তাহার শোকে আমারও প্রাণের ভিতরে কেমন একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে জানালা খুলিয়া দিলাম। অমনি বৃষ্টির সঙ্গে ভিজে ঝোড়ো-হাওয়া হু-হু হু-হু করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কপোতীর বাসার দিকে চাহিলাম। কিছু দেখিতে পাইলাম না—চারিদিকে রজনী আপনার আঁধার-বেণী এলাইয়া দিয়াছে। সে অন্ধকারের ভিতর হইতে ঝড়ের দীর্ঘশ্বাসের সহিত কেবল কপোতীর বুকভাঙ্গা কান্না অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, সে কান্না যেন পাখীর নয়—মানুষের!

গ

ভোরবেলায় উঠিয়া কপোতীকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, সে কপোতের খোঁজে গিয়াছে। সারাদিন গেল, সাঁঝের আঁধার নামিয়া আসিল,—কিন্তু কপোতী আসিল না। স্ত্রী বলিল, "ওগো, তুমি একখানা মৈ নিয়ে এসে বাসার ভিতরে কিছু খাবার আর জল রেখে দাও না! হয়ত এখনি এসে ধুঁকে পড়্‌বে—আহা, আজ ক'দিন কিছু মুখে দেয়নি, হাজার হোক্ 'কেষ্টের জীব' ত!"

মৈ বহিয়া উপরে উঠিলাম। বাসার কাছে মুখ নিয়া যাইবামাত্র দেখিলাম, কপোতী কোথাও যায় নাই;—বাসার ভিতরেই খড়্‌কুটার উপরে দু'ডানা বিছাইয়া, বুকে মুখ গুঁজিয়া নিসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। ডাকিলাম,—সে নড়িল না। তার গায়ে হাত দিলাম—মাথাটি একদিকে লুটাইয়া পড়িল। সে মরিয়া গিয়াছে।

পাখীর শোকে আর কারুর চোখে জল আসে কি না জানি না, আমি কিন্তু না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যশের মূল্য

ক

'আর্ট স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক মনোমোহনবাবুর বাড়ীতে বসিয়া, কয়েক-জন ছাত্র গল্পগুজব করিতেছিল। এমন সময়ে যোগেশবাবু আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

যোগেশবাবুও চিত্রশিল্পী। তবে, তিনি ছাত্রাবস্থা পার হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, একজন বলিয়া উঠিল, "শুন্‌চেন যোগেশবাবু! রণেন্দ্র কি বলে জানেন?"

যোগেশবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া, প্রথমে একটি সুদীর্ঘ "আঃ" উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর কহিলেন, "কি বলে হে?"

"রণেন্দ্র বলে, বাঙ্গলা দেশে তার সমান চিত্রকর এখন আর দ্বিতীয় নেই!"

"বটে! ডেঁপো ছোক্‌রা কোথাকার! আর আমরা বুঝি এতকাল বসে বসে স্রেফ ঘাস কাট্‌চি?" একটা বিরক্তিব্যঞ্জক মুখের ভাব করিয়া, যোগেশবাবু একচোখ বুঁজিলেন! যখন-তখন এমনি একচোখ-বোঁজা তাঁহার একটা মুদ্রাদোষ ছিল।

যে ছাত্রটি কথা কহিতেছিল, সে বলিল, "সুধু তাই নয়, রণেন্দ্র আপনাকেও সুনজরে ছ্যাখে না।"

যোগেশবাবু অবহেলাভরে বলিলেন, "ক্যান,—অপরাধ ?"

"সে বলে আপনি আদর্শের জন্যে ছবি আঁকেন না।"

"তবে কিসের জন্যে আঁকি, শুনি !"

"পয়সার জন্যে !"

যোগেশবাবু একচোখ মুদিয়া কহিলেন, "ননসেন্স !" তারপর অত্যন্ত চটিয়া কাণের পাশে এলমেল চুলগুলা সরাইয়া দিয়া অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিত্রকর র‍্যাফেলের লম্বা চুল ছিল বলিয়া তিনিও মাথায় বড় বড় চুল রাখিয়াছিলেন। সেই দীর্ঘকেশ তাঁহার মুখে আদোপেই মানাইত না ;—কারণ, বাল্যকালে একবার বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের রূপ একেবারে অপরূপ হইয়া গিয়াছিল। একে ত' রংটি তাঁর 'ব্লুব্যাক্'-নিন্দিত, তাহার উপরে মুখময় বসন্তের দাগ থাকাতে মনে হইত, কে-যেন তাঁহার মুখে বন্দুকের একরাশ ছর্‌রা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে !

ঘরের ভিতরে যে ছাত্রগুলি ছিল, তাহারা ক্রুদ্ধ যোগেশবাবুর ঘন ঘন চোখ বোঁজা দেখিয়া পরমকৌতুকভরে তাঁহার অগোচরে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ সে হাসি যোগেশবাবুর চোখে পড়িয়া গেল। ক্ষাপ্পা হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা হাস্চ বড় যে ? মজা পেয়েচ—না ?"

একজন কৃত্রিম বিনয়ের সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে

না—সেকি কথা, সেকি কথা! আপনি চটে গেলে আমরা কি হাস্‌তে পারি? তাও কি সম্ভব?"

"হু, হু—বুঝেচি বুঝেচি! আর চালাকি কর্‌তে হবে না—ঢের হয়েচে, থাম! তোমরা কি তবে বল্‌তে চাও হে বাপু, এতক্ষণ তোমরা দন্তবিকাশ করে কাঁদ্‌ছিলে? আমি হ্যাঁকা—না?" বলিয়াই যোগেশবাবু একচোখ মুদিলেন।

ছাত্রটি কোনরকমে প্রবল হাস্যবেগ দমন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না—কাঁদ্‌ব ক্যান—হাস্‌ছিলুম। রণেন্দ্রছোঁড়ার পাগ্‌লামীর কথা মনে করে হাস্‌ছিলুম। ঐযে—মাষ্টার-মশাইএর সঙ্গে রণেন্দ্র আস্‌চে।"

মনোমোহনবাবুর সহিত রণেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল।

যোগেশবাবু একবার বক্র কটাক্ষে রণেন্দ্রের দিকে চাহিয়া মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "শুন্‌চেন মশাই, রণেন্দ্র আমাকে কি বলে?"

মনোমোহনবাবু জানিতেন, এই দুটি লোকের ভিতরে বরাবর একটা না-একটা গোলমাল লাগিয়াই থাকে। লৌহ ও প্রস্তরবিশেষের মত এরা একসঙ্গে মিলিলেই অগ্ন্যুৎপাত অনিবার্য্য। তিনি বুঝিলেন, আজ আবার একটা নূতন-কিছু ঘটিয়াছে। মৃদু-মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রণেন্দ্র কি বলে যোগেশবাবু?"

"রণেন্দ্র বলে আমি পয়সার জন্যে ছবি আঁকি, আমার কোন আদর্শ নেই!"

মনোমোহনবাবু বলিলেন, "হ্যা রণেন্দ্র?"

রণেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখন একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বলেচি—আমার ঐ মত।"

যোগেশবাবু মুখ খিচাইয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, "ভারি মত দেনেওয়ালা যে! মরে যাই আর কি! সেদিনকার ছেলে তুমি—এরি মধ্যে মুখে এত লম্বা লম্বা কথা—অ্যাঁ?"

মনোমোহনবাবু বলিলেন, "যেতে দিন যোগেশবাবু, যেতে দিন! রণেন্দ্র ছেলেমানুষ—আর কথাটাও অতি তুচ্ছ, এ নিয়ে আর বকাবকি করে কাজ নেই!"

যোগেশবাবু একটুও শান্ত না হইয়া বলিলেন; "ছেলেমানুষ! রণেন্দ্র ছেলেমানুষ! মুখে যার অত বড় গোঁফ—সে যদি ছেলেমানুষ হয়, তবে বুড়ো বলে কাকে মনোমোহনবাবু?"

একটি ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে, একটু আগে আপনি নিজেইত' ওকে ছেলেমানুষ বল্‌লেন!"

যোগেশবাবু চটিয়া লাল হইয়া কহিলেন, "কখন বল্‌লুম?"

"এই—একটু আগে!"

"ভুল—ভুল শুনেচ! অতবড় যার গোঁফ, আমি তাকে ছেলেমানুষ বল্‌ব? অসম্ভব! তোমরা কি বল্‌তে চাও হে বাপু, আমি চোখের মাথা একেবারে খেয়েচি?"

ছাত্রেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে না, আমরা এ কথা কখনই বল্‌তে চাই না।"

মনোমোহনবাবু কোনরকমে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "চুপ—চুপ! গোলমাল করো না।"

যোগেশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁহে রণেন্দ্র, তোমার মতে তুমিই নাকি বাঙ্গলার সব্‌-সে-সেরা চিত্রকর?"

রণেন্দ্র কহিল, "আমার যে এই মত কোত্থেকে জানলেন আপনি ?"

"তোমার বন্ধুরাই বল্‌ছিল !"

"না—এ আমার কথা না ! তবে এ কথা বলেচি বটে যে, বাঙ্গলা দেশে আমার মত প্রাণ দিয়ে আর কেউ ছবি আঁকে না।"

"প্রমাণ ?"

রণেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিল, "প্রমাণ ? প্রমাণ আবার কি ? আমার এই বিশ্বাস।"

"তোমার বিশ্বাস ভাল নয় হে বাপু !"

বেশী কথা-কওয়া রণেন্দ্রের স্বভাব নয়, সে আর কোন উত্তর দিল না।

মনোমোহনবাবু এই অপ্রীতিকর চর্চ্চা ছাড়িয়া অন্য কথা তুলিয়া বলিলেন, "রণেন্দ্র, এবারকার প্রদর্শনীর জন্যে তুমি ছবি আঁক্‌বে ত' ?"

রণেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে আঁক্‌ব বৈকি।"

"দেখ্‌ব তোমার ছবি কেমন হয় !"

রণেন্দ্র ভক্তিভরে শিক্ষকের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "আপনি যার গুরু—তার ভাবনা কি ? দেখ্‌বেন, আমার ছবি সকলের চেয়ে ভাল হবে !"

যোগেশবাবু বলিলেন, "এ যে রাম না হতে রামায়ণ দেখ্‌চি ! আগে ছবি আঁক, তারপরে জাঁক করো।"

রণেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া যোগেশবাবুর দিকে চাহিল—কোন কথা কহিল না। এই নীরব অবহেলা, বাক্য অপেক্ষা যোগেশবাবুকে বেশীরকম আঘাত দিল।

মনোমোহনবাবু বলিলেন, "যোগেশবাবু, আপনি যাই বলুন, আত্ম-

শক্তিতে রণেন্দ্রের যেমন বিশ্বাস, তেমন বড় একটা দেখা যায় না। আমি নিশ্চয় বলতে পারি. ও একদিন মস্ত নাম কর্‌বে।”

রণেন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একজন ছাত্র বলিল, “কিন্তু মাষ্টার-মশাই, রণেন্দ্রের বেশ একটু পাগ্‌লামির ছিট্ আছে।”

মনোমোহনবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ—তা আমি জানি। ভাব-প্রবণতা বেশী হলেই লোককে পাগল বলে মনে হয়। ছবিকে ভাল করে ফোটাবার জন্যে ওর কেমন একটা অস্বাভাবিক চেষ্টা আছে। রণেন্দ্র একবার কি করেছিল জান ? একদিন দেখি, রণেন্দ্রের বাঁ-হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঝর্‌-ঝর্ করে রক্ত পড়্‌চে, আর সে নিশ্চিন্ত-ভাবে বসে-বসে ছবি আঁক্‌চে। দেখে আমি ত' একেবারে অবাক্! জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, আঙ্গুল কেটে রক্তের আসল রংটা কি-রকম, তাই সে দেখ্‌চে! অদ্ভুত লোক! তোমরা এটাকে পাগ্‌লামি বল্‌তে পার,—কিন্তু এই পাগ্‌লামির জন্যেই একদিন ও অমর হবে।”

যোগেশবাবু একচোখ মুদিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “যেমন মাষ্টার, তেমনি ছাত্র—দুটিই একেবারে বদ্ধপাগল।”

খ

রণেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকে চলিল। রাস্তায় লোকজন, গাড়ীঘোড়া কত কি চলিতেছে, কিন্তু সেদিকে তার আদোপেই নজর ছিল না—কি যে তার ভাবনা, তা সুধু সেই-ই জানে।

ভাল চিত্রকর বলিয়া অল্পদিনেই সে বেশ নাম করিয়াছিল। এত শীঘ্র

তাহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া তাহার সহযোগী চিত্রকরেরা যথেষ্ট ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল—তন্মধ্যে যোগেশবাবুই প্রধান। তাহার ভিতরে যে প্রতিভা আছে, এ-কথাটা যোগেশবাবু মনে-মনে বুঝিলেও, মুখে কিছুতেই মানিতে চাহিতেন না।

অল্পদিনেই রণেন্দ্রের এতটা নাম হইবার কারণও ছিল। ছবি-আঁকাকে সে একটা সখ বা পয়সা-রোজগারের উপায় বলিয়া মনে করিত না। মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভিতরে সাধক যেমন চিন্ময়ী শক্তিকে শরীরিণী দেখে, কল্পনার মায়ালোকে সেও তেমনি আপনার জীবন-রূপিণী মানসীর লীলায়িত গতি নিরীক্ষণ করিত। সে যখন তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে বসিত, চারিদিকের এই বৃহৎ পৃথিবীর সমস্ত স্মৃতি তখন তাহার মনঃপট হইতে একেবারে পুঁছিয়া যাইত—এমন কি, নিজের অস্তিত্বের কথাও তখন তাহার স্মরণ থাকিত কিনা সন্দেহ! প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তখন সে পাগলের মত হইয়া যাইত এবং চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য সে-সময়ে নিজের প্রাণকেও বুঝি সে বলি দিতে পারিত! একনিষ্ঠ সাধক বলিয়াই এত শীঘ্র সে যশের মাল্য পাইয়াছে।

চরিত্রেও সে, ভিতরে বাহিরে সরল ছিল। এই সরলতা এবং আত্মশক্তির উপরে একান্ত বিশ্বাস থাকাতে, রণেন্দ্র রাখিয়া-ঢাকিয়া কিছু বলিতে পারিত না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকা খুব ভাল কথা। নহিলে জগতে কেহ মানুষ হইতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাস মনের ভিতরে চাপা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাহিরে ইহা বাহির হইলে পৃথিবীর কঠিন জনসমাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠে।

এখানে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। রণেন্দ্র সরলপ্রাণে যাহা বলিত,

লোকে তাহা গর্ব্ব বলিয়া ধরিয়া লইত। এবং সুমুখে কিছু না বলিলেও আড়ালে তাই লইয়া কানাকানি করিত।

সকলে সর্ব্বদাই রণেন্দ্রকে আনমনা দেখিত। কাহারও কথা সে কাণ পাতিয়া শুনিত না—কেহ জিজ্ঞাসা করিত এক, উত্তর পাইত আর—সর্ব্বদাই সে কেমন-যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত এবং কথা-বার্ত্তাতেও তেমন গোছাল ছিল না। সে বিবাহ করিয়াছে—একটি ছেলেও হইয়াছে,—পত্নীও সুন্দরী, কিন্তু সংসার বা কোন-কিছুতেই তাহার বিশেষ একটা টান্ ছিল না—অথচ তাহার হৃদয় স্নেহ-প্রেমে পরিপূর্ণ! তাহার কার্য্যে ও বাক্যে একমাত্র কামনাই প্রকাশ পাইত—তাহা চিত্র-সাধনা করিয়া অমর হওয়া! এইজন্য বন্ধুজনেরা ভাবিত, সে পাগল! কোনও ফাঁপা জিনিষকে জোর করিয়া জলের ভিতরে চুবাইয়া দিলেও যেমন ডুবাইয়া দেওয়া যায় না—তাহা উপরে ভাসিয়া উঠিবেই উঠিবে—সংসারে ভাবপ্রবণ লোকগুলিও ঠিক্ তেমনি। সংসারের গোলমালে কিছুতেই তারা ডুবিয়া থাকিতে চায় না—তাহাদের ব্যগ্র প্রাণ সংসারের উপরকার স্বাধীনতার দিকে সর্ব্বদাই উঠিয়া যাইতে চাহে।

রণেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে আপনার বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দরজার কাছে তাহার চারিবছরের খোকা, মুখের ভিতরে আঙ্গুল পূরিয়া দিয়া গম্ভীরমুখে অত্যন্ত চিন্তিতভাবে দাড়াইয়া আছে!

পিতাকে দেখিয়া খোকা ছুটিয়া আসিল। দুইহাতে রণেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, বাবা!"

"কিরে খোকা?"

খোকা বাপের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "বাবা, দেখ্‌বে এস! একটা ব্যাঙ্‌কে ইট্‌ মেরেচি, তার পা খোঁড়া হয়ে গেছে!"

রণেন্দ্র ছেলেকে কোলে করিয়া বলিল, "তা আমি কি কর্‌ব রে দুষ্টু?"

খোকা বলিল, "ব্যাঙ্‌ যে বাড়ী যেতে পার্‌চে না! তার পা খোঁড়া, কি করে চল্‌বে বাবা? চল, ব্যাঙ্‌কে কোলে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে চল!"

ব্যাঙের বাড়ীর ঠিকানা রণেন্দ্রের একেবারেই জানা ছিল না। সুতরাং সে হাসিতে হাসিতে খোকাকে লইয়া নিজের বাড়ীর ভিতরেই ঢুকিল।

এবারকার প্রদর্শনীতে কিরূপ চিত্র দিবে, রণেন্দ্র বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ঘরের দেওয়ালে তাহার হাতের আঁকা সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ নানারূপ চিত্র রহিয়াছে। কোনখানি প্রকৃতি-চিত্র এবং কোনখানি-বা মূর্ত্তি-চিত্র। কোথাও সমুজ্জ্বল সোণার মত সরিষা-ক্ষেতের উপর দিয়া শঙ্খশুভ্র বলাকাদল দিগন্তে দৃশ্যমান সবুজ বনভূমির পানে উড়িয়া যাইতেছে, কোথাও ছায়ালোক-বিচিত্র বিপুল-আয়ত ধরণীর নতোন্নত শ্যামল দেহের উপর দিয়া, অসংখ্য শিরা-উপশিরার মত নদনদীগুলি এঁকিয়া-বেঁকিয়া ক্রমাতিসূক্ষ্ম হইয়া দিক্‌-রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে, কোথাও ধূমের মত ধূসর অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা প্রখর তপন-করে আপনি দগ্ধ হইয়াও, শত শত আতপতপ্তের জন্য পদতলে স্নিগ্ধ-ছায়া রচনা করিয়া অটল-ভাবে দাঁড়াইয়া

আছে। এমনি নানা দৃশ্য। আর একদিকে নানা আকারের নর-নারীর মূর্ত্তি—হৃদয়ের ভাব তাহাদের সকলেরই মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কেহ হাস্যে উজ্জ্বল, কেহ লাস্যে চঞ্চল, কেহ ক্রোধে বিকৃতাস্য, কেহ চিন্তায় কুঞ্চিত-ললাট, কেহ বিরহে বিক্ষুব্ধ, কেহ মিলনে নন্দিত!

ঘরের উত্তর দিকে জানালার কাছে একটি 'চিত্রধরে'র উপরে একখানি অসমাপ্ত ছবি রহিয়াছে। তাহাতে বর্ণমঞ্জুল তালীকুঞ্জের চির-মৌন ছায়ার আশ্রয়ে এক মধুরযৌবনা ললনা সরসীর কৃষ্ণনীরে স্থিরবিদ্যুৎ-প্রভাবৎ শোভা পাইতেছে। যুবতীর মুখে চিত্রকরের তুলিকা, আনন্দ ও জীবনের আভাস প্রস্ফুট করিয়াছে, কিন্তু তাহার গৌর ও ক্ষীণ কটিতট বেড়িয়া রূপ-পিপাসী চপল জলের মোহন নটন এখনও ফুটিয়া উঠে নাই!

এই সকল ছবির সঙ্গে চিত্রকরের কতদিনের আশা ও হতাশা মিশান আছে! আজ কিন্তু রণেন্দ্রের চিত্তকে, তাহার এত যত্নের ও শ্রমের চিত্র-গুলি আগেকার মত তেমন আত্মীয়ের ন্যায় আকর্ষণ করিতে পারিল না! তাহার মনে হইতে লাগিল এতদিন সে স্বধু ছেলেখেলা করিয়াছে, কেবল কতকগুলা রঙ্গের উপরে রঙ্গ চাপাইয়াছে! এতদিন ধরিয়া সে যতটুকু শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে, আজ তার প্রাণ কেবল ততটুকু লইয়া কিছুতেই প্রীত হইতে পারিল না—কারণ, তাহার মানস-কল্পনা আজ উচ্চে—উচ্চে —আরও উচ্চে উধাও হইয়া চাতকের মত উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে! বরষার সজল ঋতু একবার যদি আসে, তবে গিরিনদী কি আর তখন আপন পূর্ব্ব-সংকীর্ণতার মাঝে বাঁধা থাকিতে পারে? সে তখন উদ্দাম বেগে অসীমতার দিকে ছুটিয়া চলে, একবারও ফিরিয়া তাকায় না,

আপনার পূর্ব্বাবস্থা লইয়া কিছুতেই তুষ্ট হইতে পারে না। রণেন্দ্রের মানস-নদেও আজ বিপুল আয়োজনে ভাবের বরষা নামিয়াছে।

রণেন্দ্র স্থির করিল, এবারে সে এমন ছবি আঁকিবে, যাহার সঙ্গে তাহার নাম চিরদিনের জন্য অমর হইয়া থাকিবে! তাহার মানসী যে শিশুর খেলার পুতলি নয়, এ-কথা সকলকে সে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিবে!

টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া রণেন্দ্র একমনে চিন্তা করিতে লাগিল। সে কি আঁকিবে? কোন্ বিষয়? হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সাধারণের অনুভূতি জাগিয়া উঠে—অথচ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর মর্য্যাদা অক্ষত থাকে? অঙ্কন-যোগ্য শত শত বিষয় তাহার চোখের সামনে দিয়া বায়স্কোপের ছবির মত পরে পরে চলিয়া গেল—কিন্তু কোনটিতেই তাহার প্রাণ আজ সাড়া দিয়া উঠিল না। ভাবিতে ভাবিতে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের ভিতরে ক্রমেই ঘনাইয়া আসিল—কিন্তু, চিত্রবস্তু স্থির হইল না! কুললক্ষ্মীদের মধুর ফুৎকারে পল্লীতে পল্লীতে আকুল শঙ্খ সুদূর সাগরের স্মৃতির গান গায়িয়া উঠিল এবং সেই গভীর নির্ঘোষে সচকিত হইয়া রণেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সেই অন্ধকারে সে ঘরের ভিতরে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কিন্তু বৃথা! বেদনায় ও হতাশায় রণেন্দ্রের বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল—তবু ত গোপন মানসী মূর্ত্তি ধরিল না!

অনেক রাত। অমাবস্যার আঁধারে আকাশকে যেন পরলোকের একটা গভীর রহস্যের ন্যায় বোধ হইতেছিল—রণেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মত সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

বাহির হইতে দরজায় ঘা মারিয়া পাচক ডাকিল, "বাবু !"

অত্যন্ত চমকিয়া রণেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"বাব্বু, খাবার হয়েচে, খাবেন আসুন।"

ক্রুদ্ধ রণেন্দ্র কর্কশস্বরে কহিল, "আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে'—যা, আমি এখন খাবনা !"

তাহার পর রণেন্দ্র আবার চিন্তা-সাগরে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

পৃথিবীতে যাহারা যশের মদিরা পান করিয়াছে, হায়, তাহাদের শান্তি কোথায় ?

ঘ

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে।

এই সপ্তাহকাল রণেন্দ্র বাড়ীর বাহিরে পা বাড়ায় নাই—ঘরে বসিয়া ক্রমাগত ভাবিয়াছে, কোন্ মন্ত্রে সাধনার দেবী সাকার হইয়া উঠিবেন ?

অন্য সময় হইলে তাহার বিষয়-নির্ব্বাচন করিতে এতটা দেরী হইত না—কিন্তু এবারে সে কিছুতেই আপনার উপযোগী আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অথচ যতই দিন যাইতেছে, ততই সে নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, এক-একদিন গভীর শূন্যতায় সে ক্ষ্যাপার মত দুইহাতে-মাথার চুল ছিঁড়িয়াছে, উচ্চস্বরে আপনাকে আপনি গালাগালি দিয়াছে, ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া বালকের মত কাঁদিয়াছে !

সেদিন সকালে রণেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে মনোমোহন

বাবুর দরওয়ান আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া সে দেখিল, তাহার শিক্ষক মহাশয়ের হস্তাক্ষর। রণেন্দ্র পড়িল ঃ—

"স্নেহাস্পদেষু,

প্রদর্শনীর আর বেশী দেরী নাই। আর এক সপ্তাহের ভিতরে ছবি না পাঠাইলে চলিবে না। তুমি কি করিতেছ? তোমার ছবির কতদূর?

যোগেশবাবু ইতিমধ্যেই ছবি পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ছবি আমি দেখিয়াছি। বেশ হইয়াছে।

কিন্তু তোমার কাছ হইতে আমি আরও ভাল কাজের আশা করি। তোমার মত প্রিয় ছাত্র আমার কেহ নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি গুরুর মুখ রাখিতে পারিবে।

মনে রাখিও, এই প্রদর্শনীতে যদি তোমার চিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে তোমার যশের পথে আর কোন বাধা থাকিবে না।

তোমার শিক্ষা সফল হউক। ইতি।"

চিঠি পড়িয়া রণেন্দ্র আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর এক সপ্তাহমাত্র সময়? এখনও যে তাহার চিত্রের পরিকল্পনা স্থির হয় নাই! তাইত, কি করিবে সে?

আত্মশক্তির উপরে এতদিন তাহার যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখন সে বিশ্বাসের মূলও যেন আল্‌গা হইয়া গেল! এই তুচ্ছ শক্তি নিয়া দশের মাঝে সে জাঁক করিয়া বেড়াইয়াছে! ছেলেখেলায় দিন কাটাইয়া সে ভাবিয়াছে, অমর হইবে! হায়রে কপাল! আপনার অক্ষমতার জন্য রণেন্দ্রের দুচোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

৬

বিকারের রোগীর রাত যেমন তাহার অগোচরে কাটিয়া যায়, সে রাত্রিও তেমনি কখন যে পোহাইয়া গেল, রণেন্দ্র তাহার কিছুই টের্ পাইল না। সে এ-কয়দিন চিত্রশালাতেই শয়ন করিয়াছে।

মুখে-চোখে অনিদ্রার চিহ্ন লইয়া রণেন্দ্র ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে তাহার স্ত্রী বিবর্ণমুখে ছুটিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ওগো, খোকার কি হয়েচে, দেখবে এস!"

রণেন্দ্র বলিল, "কি হয়েচে?"

লীলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বোধ হয়-বোধ হয়—কলেরা! অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না—বাছা একেবারে নেতিয়ে পড়েচে!"

অত্যন্ত বিপন্নভাবে রণেন্দ্র আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

খোকা তাহার বিছানার সঙ্গে মিশিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছে এবং শয্যার সর্ব্বত্র একটা ভীষণ রোগের চিহ্ন জাজ্বল্যমান। অমন সোণার মত দেহের রঙ্ দুদণ্ডেই যেন একেবারে 'পাঙাস্‌পানা' হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, খোকা বাঁচিয়া নাই! কেবল তাহার বুকের কাছটি ধুক্-ধুক্ করিতেছিল, তাহাতেই অতি ক্ষীণভাবে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

খোকার মাথার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রণেন্দ্র স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লীলা বলিল, "ওগো, অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও, যাও, শীগ্‌গীর্ ডাক্তার ডেকে আন।"

মায়ের গলা শুনিয়া খোকা চোখ মেলিল। অতি ক্ষীণস্বরে ডাকিল, "মা—মাগো!"

"বাবা আমার, ধন আমার,—কি বল্‌চো যাদু?" বলিতে বলিতে লীলা দুইহাতে খোকাকে জড়াইয়া ধরিল। মাতৃস্তনের উপরে মুখ রাখিয়া খোকা একেবারে এলাইয়া পড়িল।

রণেন্দ্রের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে একদৃষ্টিতে মাতৃবাহু-বেষ্টিত সেই বিবর্ণপুষ্পবৎ শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল।

লীলা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "এখনও ডাক্তার ডাক্‌তে গেলে না? তুমি কি গো!"

রণেন্দ্র অস্ফুট বাক্যে কহিল, "অঁ্যা—ডাক্তার—হুঁ!"

স্বামীর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ও অসংলগ্ন কথা শুনিয়া লীলা সচকিতে মুখ তুলিল। বলিল, "কি বল্‌চ?"

"কিছু না।"

"যাও, ডাক্তার ডেকে আন।"

"হুঁ—এই যাই।" রণেন্দ্র স্খলিত পদে উন্মনার মত ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

দুম্ করিয়া ঘরের কপাট বন্ধ হইয়া গেল। লীলা সবিস্ময়ে শুনিল, তাহার স্বামী বাহির হইতে দরজায় শিকল টানিয়া দিতেছেন! একি!

চ

রণেন্দ্র আপনার চিত্রশালার ভিতরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল।

দুইহাতের ভিতরে মুখ গুঁজিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিলে মনে হয়, সে-যেন ভীষণ একটা মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছে! চারিদিক্ অত্যন্ত নিস্তব্ধ। দেওয়ালে সুধু ব্রাকেটের উপর ঘড়ীটা অশ্রান্তভাবে টিক্-টিক্-টিক্ করিতেছিল এবং রণেন্দ্রের বুকের ভিতর হইতে তাহার হৃৎপিণ্ডটাও যেন উত্তর দিয়া তালে তালে কহিতেছিল,—ঢুপ্—ঢুপ্—ঢুপ্! যেন তাহার ভয়ানক সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া ঘড়ী আর হৃৎপিণ্ড পরস্পরের সহিত কি কানাকানি করিতেছিল! হঠাৎ রণেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হিপ্নটিজিমে অভিভূত লোক আপনার অজ্ঞাতসারে যেমনভাবে কথা কহে, তেমনিভাবে কহিল, "কি করি? এমন আদর্শ আর পাব না—কিন্তু, কিন্তু—সে যে আমার ছেলে!" বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া অত্যন্ত বিবর্ণ-মুখে আবার সে বসিয়া পড়িল এবং স্তব্ধভাবে আবার ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে তীক্ষ্ণতীরের মত একটা আর্ত্তনাদ তাহার ক্যাণে আসিয়া বাজিল।

"ওরে খোকা - কোথা গেলি রে!"

ছিলা ছিঁড়িয়া গেলে, ধনুক যেমন সহসা সিধা হইয়া যায়, চিন্তানত রণেন্দ্র ঠিক্ তেমনিভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই! একবার কাণ পাতিয়া সেই আর্ত্তনাদ শুনিল। বুঝিল, খোকা নাই।

আপনমনে বিড়্-বিড়্ করিয়া বলিল, "ভগবান্! ভগবান্! তুমি সাক্ষী—আমার কোন দোষ নেই!"

তাহার পর আপনার মাথার চুলগুলা ডানহাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া,

রণেন্দ্র আবার কি ভাবিতে লাগিল। একটু পরেই, অকস্মাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে যেমন হয়, তেমনি চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি এককোণে গিয়া টেবিলের উপর হইতে চিত্রপট, তুলি ও রং লইয়া, সে ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল।

শয়ন-কক্ষের সুমুখে, একটা জানালার কাছে আসিয়া রণেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছু শোনা যায় কি? না, সব চুপচাপ। সেই জানালা দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখা যাইতেছিল। উঁকি মারিয়া ভয়ে-ভয়ে রণেন্দ্র যাহা দেখিল, তাতে তার সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। সমস্ত বিছানাটা ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে—পুত্রহারা জননী নিশ্চয় সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিয়াছে!

আর—ওখানে, ওকি! ঘরের মেঝেতে লুটাইতে লুটাইতে ছেলের মৃতদেহ দুইহাতে বুকে আঁকড়িয়া লীলা, এলোচুলে, বিস্ফারিত-নেত্রে খোকার অসাড় ওষ্ঠে, প্রাণপণে চুম্বন করিতেছে!

রণেন্দ্রের দুইচোখে কে-যেন দুটো শলা বিঁধিয়া দিল! অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া অনেক কষ্টে আপনাকে সামলিয়া রণেন্দ্র, পটের উপরে তুলির প্রথম রেখা টানিল! তাহার সুমুখে—ঘরের ভিতরে সেই ভয়ানক আদর্শ! জগতের আর কোন চিত্রকর বোধ হয়, এমন আদর্শের সামনে তুলি ধরেন নাই!

বাহিরে, রণেন্দ্রের দেহে কোন চাঞ্চল্য ছিল না। কিন্তু তার মনের ভিতরটা কি করিতেছিল, কে তা বুঝিবে? সে যে পিতা!

রণেন্দ্র তাড়াতাড়ি ছবি আঁকিতে লাগিল,—জীবনে এত তাড়াতাড়ি সে আর কখনও আঁকে নাই! তার আঙ্গুলে কোন অজ্ঞাত শক্তি আজ

যেন কি মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছিল! আঁকিতে আঁকিতে শুনিল, "খোকা, ও খোকা! কথা ক' বাপ্, কথা ক'—একটিবার চোখ চা যাদু!"—

রণেন্দ্র অস্ফুটস্বরে কহিল, "ওঃ! আর যে পারি না!" তাহার হাত হইতে খসিয়া তুলি মাটিতে পড়িয়া গেল।

কিন্তু তখনি তুলিটা তুলিয়া লইয়া সে আবার আঁকিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে লীলার ক্রন্দন-স্বর তাহার শ্রবণ দিয়া মর্ম্মে পশিয়া ধমনীর রক্তপ্রবাহ যেন বন্ধ করিয়া দেয়, তাহার হস্তকে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় করিয়া তুলিকার গতি থামাইয়া দেয়—কিন্তু অনতিবিলম্বেই আবার সে আত্মসংবরণ করে। এমনি করিয়া মিনিটের পর মিনিট কাটিতে লাগিল।

সদর দরজায় ততক্ষণে ভিতরে আসিবার জন্য চাকর-বামুনেরা গোলমাল সুরু করিয়াছে। কিন্তু, রণেন্দ্র তখন জগতের আর সব শব্দের দিকে যেন কালা হইয়াছিল—সে কিছুই শুনিতে পাইল না! সে তখন একবার ঘরের ভিতরে, আর একবার পটের উপরে চাহিতেছিল, একবার রঙে তুলি ডুবাইতেছিল, আর একবার পটে তুলি বুলাইতেছিল—সে যে পিতা এবং ঘরের ভিতরে পত্নীর বুকে ও যে তার মৃতপুত্র—এ স্মৃতিটুকুও বুঝি সে, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতেছিল!

হঠাৎ লীলা তাহাকে দেখিতে পাইল। ছুটিয়া, জানালার কাছে আসিয়া সে সক্রন্দনে বলিয়া উঠিল, "ওগো, ডাক্তার ডেকেচ গো! একবার এসে দেখে যাক্ যাদু আমার বেঁচে আছে কিনা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ওকি! ছবি আঁকচ, ছবি আঁকচ!"

চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রণেন্দ্র পাংশুমুখে লীলার দিকে চাহিল।

সে পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি কোনরকমে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

বাহির হইতে দরজা ঠেলিয়া ও ক্রমাগত চেঁচাইয়াও যখন দরজা খুলিল না, বামুন ও চাকর তখন ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা ঠিকা লোক,—রোজ সন্ধ্যায় কাজ সারিয়া চলিয়া যায় আর সকালে কাজে আসে। প্রত্যহ দরজা ঠেলিলেই হয় রণেন্দ্র, নয় লীলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিত—আর, আজ এত বেলা, এত ডাকাডাকি-ঠেলাঠেলি, তবু কপাট খুলিল না কেন? এদিকে মাঝে মাঝে তারা লীলার গুম্‌রাণো কান্নার শব্দও শুনিতে পাইতেছিল!

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তারা পাড়ার পাঁচজনকে ডাকিল। অবশেষে, সকলে মিলিয়া অনেক পরামর্শের পর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল!

সকলে একটু সঙ্কুচিতভাবে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিল, দেয়ালে ঠেশ্ দিয়া, দুইহাতে দুইহাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া, রণেন্দ্র, হেঁটমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

তাহাদের পদশব্দে চমকিয়া রণেন্দ্র মুখ তুলিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ—লক্ষ্যশূন্য! খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, সাম্‌নের চিত্রপটের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ডাক্তার! ডাক্তার! আমি অমর হয়েছি!"

ছ

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়াছে।

প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিষ অনেক—কিন্তু দর্শকেরা বিশেষ করিয়া একখানি ছবির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ছবিখানি ছোট এবং এখনও অসমাপ্ত। ছবির নাম, "শেষ চুম্বন।"—ছেলের মৃতদেহ বুকে করিয়া, জননী আপনার হৃদয়-দুলালের চাঁদমুখে জন্মের শোধ শেষবার চুম্বন-দান করিতেছেন,—ইহাই চিত্রের বিষয়।

শোকাতুরা জননীর মুখে, চোখে ও দেহে, চিত্রকরের তুলিকা এমন একটি করুণভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, যিনিই দেখিতেছেন, তিনিই কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। চিত্রের ভিতরে যে এতটা করুণরস থাকিতে পারে, একথা আগে কেহ কল্পনা করিতেও পারে নাই।

ভিড়ের ভিতরে কয়েকজন চিত্রকরও ছিলেন। একজন বলিলেন, "দেখুন যোগেশবাবু! আপনি কি বলেন?"

যোগেশবাবু তখন অবাক্ হইয়া ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন শুনিয়া, একচোখ মুদিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আগে জান্‌লে রণেন্দ্রকে আমার গুরু কর্‌তুম।"

দর্শকদের ভিতরে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। কিন্তু কেহ জানিল না, এ যশের মূল্য কি? শুনিলেও, হয়ত' কেহ বিশ্বাস করিত না। শিল্পী যে সোণার মত আপনি পুড়িয়া খাক্ হইয়া, শিল্প-লক্ষ্মীর কনক-চরণে নূতন ভূষণ দিয়াছে, এ খোঁজ কেহ পাইল না।

জীবন-যুদ্ধে

ক

খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাকুরি আর মিলিল না। তাহার বিদ্যার অভাব ছিল না; অভাব ছিল সুধু সুপারিসের। বিদ্যার অভাবে চাকুরি হয়। সুপারিসের অভাবে হয় না।

বড়সাধে পিতা, ছেলের অপূর্ব্ব নামকরণ করিয়াছিলেন,—কুবেরচন্দ্র। একালের রাজ্যশূন্য মহারাজের মত কুবেরও যে ঐশ্বর্য্যশূন্য হইতে পারে, নামকরণের সময়ে পিতার সে খেয়াল আদোপেই ছিল না।

বাঙ্গলাদেশে, পয়সা যদিও সুলভ নয়, কিন্তু 'বিয়ের কনে' বড় সুলভ। কুবেরচন্দ্রের এফ, এ পাশ করিবার পূর্ব্বেই রাঙ্গা-বউ ঘরে আসিল। এবং বছর-তিন যাইতে না যাইতেই শ্রীমান কুবেরচন্দ্র বেশ ভালরকমেই টের পাইলেন যে, উর্ব্বরা বঙ্গভূমির কোলে মানুষ হইয়া তাঁহার স্ত্রী সরলাও বেশ সুফলা! ইতিমধ্যে কুবেরচন্দ্রের পিতাও নিশ্চিন্তমনে পৃথিবীর হাজিরা-বই হইতে নাম কাটাইয়া অনন্ত অবসর লইলেন। সারাজীবন চার্ব্বাক মুনির মতাবলম্বী হইয়া বৃদ্ধ, ঋণ করিয়া বিস্তর ঘৃতপান করিয়া

ছিলেন। অতএব, তাঁহার মৃত্যুতে পাওনাদার-মহলে একটা বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

কিন্তু, উপায় নাই। তাগাদার জন্য, সাইলকেরা ঋণীর পিছনে উলুবেড়ে হইতে 'হনোলুলু'তে গিয়াও হাজির হইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে স্তব্ধ এবং জব্দ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে, স্বর্গগমন। কুবেরের পিতা, এই চরম এবং পরম উপায় অবলম্বন করিয়া, পাওনাদারদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

কিন্তু তাহারাও 'নাছোড়্-বান্দা'। অগত্যা, পিতার 'ধার্ করিয়া ঘৃতপানের' ফলে, পুত্র কুবেরচন্দ্রকে একমাত্র বসতবাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইল।

যুবতী স্ত্রী, দুটি সন্তান আর নেংটি ইঁদুর, আর্সুলা ও উইপোকা-ভরা তোরঙ্গসমেত কুবেরচন্দ্র 'ভাড়াটে বাড়ী'তে গিয়া উঠিল। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বাস করিয়া-করিয়া কুবেরের অভ্যাস এমনি খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, বাসাবাড়ীতে মাসের শেষে ভাড়া দিতে হয়, এ কথা তার মোটেই মনে থাকিত না।

কিন্তু বাড়ীওয়ালা সে কথা মনে করাইয়া দেওয়া দরকার বিবেচনা করিত। ফলে, কুবেরচন্দ্র অন্দরে আসিয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিত, "ওগো, শুনচো?" সরলার দুইস্তনে, তখন হয়ত দুটি শিশু নীরন্ধ্রে দোদুল্যমান, এবং তাহার বাটনার হলুদমাখা হাতে ভাতের 'কাটি'! সে উত্তর দিত,

"হুঁ।"

"বাড়ীওলা, ভাড়া চাইচে যে!"

"তা আমি কি কর্ব্ব?"

কুবের অপ্রতিভ হইয়া কহিত, "হ্যাঁ—তা—না—কি জান, তাই বল্‌চি।"

"আমাকে বল্লে কি হবে ?"

কি যে হবে, সেটা কুবেরও জানিত না। তবে, একটা কিছু হওয়া চাই, এটুকু সে বুঝিত।

সরলা ভাতের হাঁড়ীতে সরাখানা চাপা দিয়া 'ন্যাত'ায় হাত পুঁছিয়া বলিত, "বেটাছেলে হয়ে, লেখাপড়া শিখে এমন করে বসে থাক্‌তে লজ্জা করে না তোমার ! এই যদি মনে ছিল, তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন ?"

কুবের আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত না, সরলার কথায় বড় 'ঝাঁঝ' ! সে যে ইচ্ছা করিয়া বসিয়া নাই, এই সহজ সত্যটা সরলা কিছুতেই বুঝিত না। একটা ১৫ টাকা মাহিনারও চাকুরি পাইবার জন্য, সে কোথায় না গিয়াছে ! কতনা সন্ধান, কতনা হাঁটাহাটি, কতনা খোসামুদি ! কিন্তু চাকুরি মিলে না,—চাকুরি মিলে না ! হায় চাকুরি !

পাওনাদারের তাগাদা, বাড়ীওয়ালার রক্তচক্ষু, অথচ হাতে একটি পয়সা নাই—এরূপ অবস্থায় বাহির হইতে ক্রমাগত ধাক্কা পাইলে, মানুষের মন সহজেই একটা অবলম্বন খোঁজে, একটু হাঁফ্‌ ছাড়িবার জায়গা চায়, দুটি আশার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। যার সুগৃহিণী থাকে, সে আশ্রয় পায়। তখনি প্রিয়ার মৃদুবাণী, উৎসাহভরা প্রেমপেলব চোখদুটি, সমবেদনামাখা সেবানিপুণ কোমল করের অমৃতস্পর্শ,—জীবনযুদ্ধে নমিত-ভগ্ন হতভাগার নিখিল ক্লান্তি অপনোদন করে। কিন্তু কুবের সুগৃহিণী পায় নাই। এর চেয়ে পোড়াকপালের কথা দুঃখীর ঘরে আর কি আছে !

আজ সকালে, কোন ঔষধের দোকানে কর্ম্মখালির একটি বিজ্ঞাপন পড়িয়া, কাক-চিল্ ডাকিবার আগেই, সে বিজ্ঞাপন-নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া হাজির হইয়াছিল।

বাহির হইতে ডাকিবামাত্র, জনৈক একচক্ষু মূর্ত্তি হুঁকা-হাতে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ কুবেরকে 'আষ্টেপিষ্টে' নিরীক্ষণ করিয়া সে কহিল, "কি চান মশায় ?"

"এখানে কাজ খালি আছে শুনে এসেছি।"

লোকটা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে তার একমাত্র চোখ বুজিয়া কি-যেন ভাবিতে লাগিল ; তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, "ও হো-হো ! বুঝিচি ! তুমি বুঝি আমার বিজ্ঞাপন পড়ে এসেচ ? আরে নিরেট, এটাও বোঝনি, যে কর্ম্মখালি আর লোক চাই বলে বিজ্ঞাপন না দিলে, কেউ সেটা পড়্‌বে না ! বলি, ওষুধ-টষুধ কিন্‌বে কি,—খুব তাজা ওষুধ, 'সর্ব্ববিধ জ্বর-হর' ! কেনো ত' ঘরের ভেতরে এস, নৈলে পথ দেখ বাবা, পথ দেখ।" বলিয়া, ক্ষণিকের জন্য সে একচক্ষুতে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ এমনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল যে, রাস্তার ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া একটা কুকুর শুইয়াছিল, সে কাণখাড়া করিয়া উঠিয়া, ল্যাজ গুটাইয়া একি হইল ভাবিয়া চোঁচা দৌড় দিল।

ম্রিয়মাণ হইয়া কুবের বাসার দিকে ফিরিল। বাসায় পৌছিয়া দেখিল, ছেলে আর মেয়ে দরজার চৌকাঠে বসিয়া কাঁদিতেছে।

কুবের রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েচে কি, কাঁদছিস্ বড় যে !"

মেয়ে বলিল, "মা মেরেচে, দুধ খেতে দেয় নি।"

ছেলে-মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কুবের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

সরলা আসিয়া অবজ্ঞাভরে কহিল, "কাজের কি হল ?"

হতাশভাবে রোয়াকের উপরে বসিয়া পড়িয়া কুবের কহিল, "হল আর কি ! রোজ যা হয়ে আস্‌চে, তাই।"

সরলা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বেশ !"

তারপর, বালতিটা সশব্দে তুলিয়া নিয়া দুম্‌ করিয়া কলতলায় ফেলিয়া, কল খুলিয়া দিয়া বলিল, "শুনতে পাচ্চ, গয়লা আজ দুধবন্ধ করেচে, বলে গেছে, নালিশ করে দাম আদায় কর্ব্বে, তবে ছাড়বে।"

কুবের কোন জবাব দিল না, নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

"বাড়ীওলা এসেছিল। বলে গেল, জোচ্চর্ বাপের জোচ্চর বেটা, তিনদিনের মধ্যে বাড়ীখালি কর্ত্তে হুকুম দিয়ে গেছে। বল্লে, সে ভাড়া চায় না, আমরা এখান থেকে বিদেয় হলে বাঁচে।"

কুবের, আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোবদনে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খ

খোলার বাড়ী। মেটে দেওয়াল। চালের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া ঘরের ভিতরে পড়িয়াছে।

একদিকে একটি কাঠের তোরঙ্গ। তার উপরে কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা আসবাব। তারই একটিপাশে বসিয়া কুবেরচন্দ্র আকাশপাতাল ভাবিতেছে।

মেঝের উপরে একখানা 'শতচ্ছিন্ন' মাদুর পাতা, তাহার উপরে শুইয়া

সরলা ছোট মেয়েটিকে স্তন্যপান কারাইতেছে। পাশে বসিয়া ছেলেটা আর্ত্তকণ্ঠে চ্যাচাইতেছে।

তিনদিন হইল, কুবেরচন্দ্র কোঠাবাড়ী ছাড়িয়া এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। আজ সকালে তাহাদের অন্ন পর্য্যন্ত জোটে নাই।

খোকার চীৎকার কিছুতেই থামিল না দেখিয়া সরলা তিক্তকণ্ঠে কহিল, "ওরে, আর যে পারি না, হাড় যে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল! তোরাও মর্ আমিও মরে জুড়োই। এমন কপাল করে এসেছিলুম যে, স্বামীও স্ত্রীলোকের অধম!"

কুবের তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল। সরলা বলিল, "আবার রাগটুকু আছে,—ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান!"

তাহার এই রূপ, এই যৌবন, এই আশা—একটা গরীবের হাতে পড়িয়া সকলই ব্যর্থ! স্বামীর দারিদ্র্যকে যখন ধিক্কার দিত, সরলা তখন ভুলিয়া যাইত যে, সে নিজেও গরীবের মেয়ে! আর, স্বামীর অভাব-কাতর মুখ দেখিয়াও সে আপনার কর্কশ কথা বন্ধ করিতে পারিত না। সুধু কুবের বলিয়া নয়, তাহার রূপকে ব্যর্থ করিয়াছেন বলিয়া বিধাতাকেও সে অমনি-অমনি ছাড়িয়া দিত না! "পোড়াকপালে বিধাতা! অদেষ্টে যদি এত ছিল, তবে এমন রূপ, এমন যৌবন কেন?" ঠিক কথা!

কুবেরচন্দ্র রাস্তায় বাহির হইয়া বরাবর চলিল। আজ এক বাল্যবন্ধুর কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। ভাবিল, ভবেশ আমাকে বড় ভালবাসিত, আজ দুঃসময়ে হাত পাতিলে, নিশ্চয়ই সে অমনি ফিরাইয়া দিবে না।

মস্ত এক তেতলা বাড়ী। কুবের যখন সেই বাড়ীর ফটকের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ফটকের পাশে বসিয়া, বামকরতলে 'শুকা' দোক্তা

পিষিতে পিষিতে দন্তকণ্টকিত বিরাট্ মুখ-বিবর উন্মুক্ত করিয়া হনুমান সিং গায়িতেছিল—

"দে নয়নমে তালা লাগায়ে—"

অনেক কষ্টে, দরোয়ানকে অনেক খোশামোদের পরে, তবে কুবের ভবেশের দেখা পাইল। ভবেশ, তখন একখানা আরাম-কেদারায় আড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বামহাতে একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ, আর ডানহাতে অঙ্গুলধৃত একটি ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট। সামনের মার্ব্বেল টেবিলে রৌপ্যনির্ম্মিত পাণের ডিবা ও 'অ্যাশট্রে'।

ঘরখানি য়ুরোপীয় কায়দায় সাজানো। গডফ্রে সিল্কের ভিত্তি-প্রচ্ছাদনী দিয়া দেওয়ালগুলি অলঙ্কৃত, শার্শির কাঁচে-কাঁচে রঙিন্ নিসর্গ-ছবি। জানালায় জানালায় পুঁতির পর্দ্দা। চারিদিকে রুবেন, কনষ্টেবল, রোম্‌নি, রেনল্ডস, ল্যাণ্ডসিয়র ও গেনস্‌বরো প্রভৃতি ওস্তাদ-শিল্পিগণের চিত্র-প্রতিলিপি। ঘরের কোণে কোণে লাঅকোঅন ও ভিনাস ডি মিলো প্রভৃতির প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং আশেপাশে নানাধরণের সুখদ গদীমোড়া অসংখ্য চেয়ার, চীনামাটীর টবে করিয়া জাপানী "বামন গাছ" ও চিত্রিত বস্ত্রাবৃত মেজ।

ভবেশ প্রথমটা কুবেরকে চিনিতে পারে নাই। তারপর, যখন চিনিতে পারিল, তখন সহজস্বরে ডাকিল, "কে ও, কুবের নাকি? এস, এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

কুবের সঙ্কোচের সহিত ধূলি-মলিন অনাবৃত পদে মূল্যবান্ কার্পেটের উপর পদচিহ্ন আঁকিয়া, ভবেশের সাম্‌নে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখের ভিত্তিবিলম্বিত প্রকাণ্ড দর্পণে তাহার মূর্ত্তি বিম্বিত হইল। সেদিকে নজর পড়াতে সে-যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, তাইত', এখানে আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! এই সাজানো ঘরে আমাকে কি-রকম বে-মানান্ দেখাইতেছে!

ভবেশ বলিল, "কিহে, অমন করে জুজুর মত দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? একি! তোমার পায়ে ন্যাকড়া বাঁধা যে? হয়েচে কি?'

"কেটে গেছে।"

মিথ্যাকথা! তার জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল,—আবার যে নূতন জুতা কেনে, এমন পয়সা নাই। ধনী বন্ধুর বাড়ীতে না আসিলে নয়,—অথচ ভদ্রতার খাতিরে খালিপায়েও আসিতে পারে না। কাজেই পায়ে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়াছিল। লোকে ভাবিবে, ক্ষতের ভয়ে পায়ে জুতা নাই।

ভবেশ বলিল, "ঐ চেয়ারে বসো। স্কুল ছেড়ে এই প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হল; এস, ছুটো কথাবার্ত্তা কই।"

পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনের জন্য ভবেশ কথায় আগ্রহপ্রকাশ করিল বটে, কিন্তু তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবশূন্য। তার মুখ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই, যে, সে আনন্দিত কিংবা বিরক্ত।

কুবের চেয়ারের উপরে আড়ষ্টভাবে বসিয়া বলিল, "কেমন, ভাল আছত, ভবেশ!" বলিয়াই, তার মনে হইল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ এই কুশল-জিজ্ঞাসাটা বড়ই বেখাপ্পা হইয়া গেল।

ভবেশ সিগারেটের দগ্ধাবশেষটা অবহেলাভরে 'অ্যাশ্‌ট্রে'র উপরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "অমনি চলে যাচ্ছে দাদা! কিন্তু তোমায় অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

ভবেশের অগোচরে, আপনার পরোনের কাপড়ের ছেঁড়া-দিকটা ঢাকা দিতে-দিতে ম্লানমুখে কুবের বলিল, "পেটের ধান্ধায় ভাই, পেটের ধান্ধায়! আমার অবস্থা, তুমি এই স্বর্গে ব'সে কল্পনাও কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

কুবেরের কথার ভঙ্গী শুনিয়া ভবেশ একটু গম্ভীর হইয়া বসিল। তারপর চোখ বুজিয়া একটা 'হাই' তুলিয়া, হাতে তুড়ি দিতে-দিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা কুবের, এতদিনপরে এ অধীনকে হঠাৎ স্মরণ হ'ল কেন?"

কুবের, এ-রকম প্রশ্নের প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া মনে মনে ভাবিল, কি বলি? আমার আসার উদ্দেশ্যটা সরলভাবে খুলিয়া বলিব? না, না, যখন এসেছি, তখন একটু পরেই না হয় সকল কথা বলা যাবে। কথাটা এখনি পাড়্‌লে, বড় খারাপ শুনাবে।

প্রকাশ্যে বলিল, "কেন ভাই, বন্ধু'র কাছে কি আসাটাও নিষিদ্ধ?"

ভবেশ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুবেরের দিকে চাহিল। তারপর, একটা রূপার ছোট শলা দিয়া দাঁত খুটিতে-খুটিতে কহিল, "সে কি কথা,—তুমি একশোবার আস্‌তে পার, এখানে তোমার অবারিত দ্বার। ভাই, বন্ধু যদি বন্ধুর কাছে না আস্‌বে, তাহলে মানুষ কি বাঁচ্‌তে পারে? জগতে বন্ধুত্বের মত জিনিষ আর কি আছে? তোমরা রোজ আস্‌বে, দুটো আমোদের কথা বলবে, দুটো সৎপরামর্শ দেবে, আমার বাড়ীকে তোমার নিজের বাড়ী মনে কর্ব্বে,—আমি ত' এই চাই। কিন্তু এ-রকম বন্ধু আজকালকার বাজারে মেলা ভার। এই ছাখনা,—কাল একটা লোক এল,—ছেলেবেলায় কবে বুঝি তাঁর সঙ্গে পড়েছিলুম! আমার

কাছে এসে সেই পরিচয় দিয়ে বল্লেন, তাঁর অবস্থা নাকি বড় খারাপ হয়েচে,—কিছু টাকা চাই। কি আর করি, দিলুম পাঁচটা টাকা! আচ্ছা, বলদিকিন্ ভাই, এরকম বন্ধু কে চায়? আরে কেও,—রাজচন্দ্র যে! সেদিন বাজী জিতে ভারি পালিয়েছিলে, আজ এসত চাঁদ! একহাত খেলা যাক, দেখি কে হারে কে জেতে!"

কুবের পিছন ফিরিয়া দেখিল, ঘরের ভিতরে একজন নূতন লোক আসিয়াছে। একেত' ভবেশের বক্তৃতার চোটে তাহার 'তাগ' লাগিয়া গিয়াছিল, তারপর এই তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে সে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িল।

রাজচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে দাবার ছক পাড়িল। কুবের উঠিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আজ তাহ'লে আসি' ভবেশ!"

ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোঁচাটা দুই-একবার ঝাড়িয়া, দাবার ছকের দিকে তাকাইয়া বলিল, "এরি মধ্যে! কিছু জলটল খেয়ে যাও!"

'না ভাই, আজ মাফ করো,—সে আর একদিন হবে অখন।" বলিয়া, কুবের তাড়াতাড়ি প্রস্থান,—একরকম পলায়নই করিল।

ভবেশ 'বোড়ে' সাজাইতে সাজাইতে গমনশীল কুবেরের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া, তাহার অগোচরে বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

রাজচন্দ্র কহিল "লোকটা কে হে?"

"ভবঘুরে—আর কি?"

"এখানে কি কর্ত্তে এসেছিল?"

দাবার সামনের 'বোড়ে' টিপিয়া ভবেশ বলিল, "মধুর লোভে। তা এমন হুল ফুটিয়েছি, বাছা আর এ-মুখো হবেন না।"

গ

রাস্তায় আসিয়া, কুবের যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই বাল্যবন্ধু! ইহারই আশায় সে এখানে আসিয়াছিল? আসিয়া কি দেখিল? বড়মানুষী আর উদাসীনতা! আবার বলে কিনা, 'জল খেয়ে যাও!'—কি পরিহাস!

খানিকদূর গিয়াই সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভাবিল, কোথাই যাই? বাসায়? কেন? কোন্ আকর্ষণে? স্ত্রী আমায় ভালবাসে না, দেখিলেই কটু বলিবে; ছেলে-মেয়ের পেটে ভাত নাই,—ক্ষুধায় তাহারা ক্রন্দন করিবে। দুই অসহ্য! তবে?—

ভাবিতে ভাবিতে, সে আবার চলিতে সুরু করিল। ভাবিল, জীবনে যার কোন লক্ষ্য নাই, মায়া নাই, সান্ত্বনা নাই,—কোন্‌দিকে যাইবে, এ কথা সে কেন ভাবে?

দেখিল, সন্ধ্যা হইয়াছে, আলোর মালা পরিয়া নগর হাসিতেছে। পথে লোক, আর লোক, আর লোক,—কি জনতা! সবাই হাস্যমুখ, সবাই সুখী! হাসিবে না কেন? ঘরে তাদের স্নেহশীল পিতা, যত্নপরায়ণা মাতা, সেবাতৎপরা ভগ্নী, প্রেমবতী পত্নী! সবাই হাসে,—হাসিবে না কেন?

দেখিল, দিনমজুরেরা কাজের বোঝা ফেলিয়া নিশ্চিন্তপ্রাণে ঘরে ফিরিতেছে; মুখে তাদের আসন্ন অবসরের মধুর আনন্দ—আমোদের উচ্ছ্বাস! হা ভগবান্, ঐযে ভিখারী ভিক্ষা মাগিতেছে, ওর কাতরতার পিছনেও শান্তির আরাম আছে—ওর ঘরেও হয়ত' শিশুর কান্না নাই! ঈশ্বর! কেন আমায় পৃথিবীতে পাঠাইলে? পাঠাইলে ত, কেন ভদ্রঘরের ছেলে করিয়া, জীবনকে আমার তপ্ত অভিশাপে পরিণত করিলে? ওগো

আমি যদি মজুর হইতাম! আমি যদি ভিখারী হইতাম! না, তা ত' নই! আমি ভদ্রলোক! মজুরী করিলে আমার যে অপমান! ভিক্ষা মাগিলে, আমার যে মাথা কাটা যাইবে! ধিক্!

দেখিল, কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের বাড়ীগুলি লোকে-লোকারণ্য! সেখানে গানের মূর্চ্ছনা, নূপুরের রিঞ্জনা, বাজনার ব্যঞ্জনা! পথ কাঁপাইয়া, দীনকে চাপা দিয়া, মৃতকে জাগাইয়া জুড়ী গাড়ীর পর গাড়ী আসিতেছে; মাথায় টেড়ী, চোখে চষমা, গলায় হীরার বোতাম্, বুকে সোণার চেন, হাতে ছড়ী, আঙ্গুলে আংটী, পরোণে মিহি কাপড়, পায়ে মকমলের পম্প্—বাবুর পরে বাবু গাড়ী হইতে নামিতেছেন, বাড়ীর উপরে উঠিতেছেন, উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছেন, ঝমাঝম্ টাকা ফেলিতেছেন!

চারিআনা পাইলে আজ আমাদের প্রাণ বাঁচে, আর ওরা কিনা মিথ্যা, ঘৃণিত আমোদের জন্য, পাপকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, অর্থকে ব্যর্থ করিবার জন্য, অবহেলায় টাকা উড়াইতেছে! বিশ্ব কি ওদের জন্য,—আমি কি কেউ নই, আমার কি কোন অধিকার নাই? আমরা কি এক আকাশের তলায় বাস করি না, আমরা কি এক প্রাণবায়ু গ্রহণ করি না, আমরা কি একই হাতের গড়া নই! হারে জগৎ!

নাঃ! আর ভাবিতে পারি না—এ ভাবনা, গভীর, অকূল, অসীম! কুবের হঠাৎ দাঁড়াইল। সাম্‌নে ও কি দেখা যায়?

গঙ্গা! গঙ্গা! তরঙ্গবলয়িতা, সঙ্গীতোচ্ছ্বসিতা, জ্যোৎস্নাধবলিতা গঙ্গা! তাঁহার উল্লোলনৃত্যের ছন্দে-ছন্দে ভক্তসমর্পিত পুষ্পমাল্য মৌন উল্লাসে নাচিয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্তম্ভিত অম্বরের প্রতিবিম্ব বুকের উপরে শতধা হইয়া যাইতেছে।

সিকতাশয়নে শীতল কর বুলাইয়া, জলবেণী দুলাইয়া. ধীরে ধীরে লীলায়িত গতিতে ফেণবিভূষণা সলিলরূপিণী মা আমার, বহিয়া যান আর বহিয়া যান, সাগরপানে বহিয়া যান !

"পতিত-পাবনী, তোর কোলে এ অভাগাকে ঠাঁই দে মা, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্।"

কুবের প্রাণ ভরিয়া গঙ্গাজল পান করিল,—তার সকল ব্যথা যেন পলকে দূর হইয়া গেল।

ঘাটে জনমানব নাই। ভিজা মাটীর উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, কুবের একলা একমনে গঙ্গাকে দেখিতে লাগিল। দূরে শ্মশান। নিশীথ রাত্রি এবং গভীর অন্ধকার! সেই অন্ধকারে চিতার আগুন জ্বালাইয়া পরলোকের পথে অদৃশ্য যাত্রীরা যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রায় চলিয়াছেন !

সহসা সুদূরের নৌকায় মেঠোসুরে কে গান ধরিল :—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পাল্লাম না।
সারা জনম বাইলাম বৈঠারে
ও তোর মনের নাগাল পালাম না।"

কি উদাস গান—কি হতাশসুর! সে সুরের ভিতরে প্রতিকথায় যেন কোন তাপিত প্রাণের নিখিল সমর্পণের স্বর ফুটিয়া উঠিতেছে এবং তাহার সঙ্গে গঙ্গাও যেন সলিলহস্তে কুবেরের দেহস্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে আয়, ওরে আয়! দুঃখ ভুলিবি ত আমার কোলে আয়! ওরে, আয় রে বাছা, আয়!"

কুবেরের মনও যেন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিল। উদ্‌ভ্রান্তের

মত সে গঙ্গাকূলে উপুড় হইয়া পড়িল। সেখানে মাটীর ভিতর হইতেও যেন সেই আহ্বান সে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল! "ওরে, আয় রে বাছা আয়, আমার কোলে আয়!"

হঠাৎ সে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, ঠিককথা। আমার ত বাঁচা-মরা দুই সমান!

সংসার আমাকে ঠেলিয়াছে, আমিও কেন এই অতলে সব বোঝা নামাইয়া দি না? জীবনে শান্তি পাইলাম না, দেখি, মরণে পাই কিনা?

সে জলে নামিল,—ক্রমে, আরও—আরও বেশী জলে। তার কোমর ডুবিল, বুক ডুবিল, গলা ডুবিল, মুখ ডুবিল,—তারপর, আঁধার—আঁধার!

নাঃ! বড় অন্ধকার গো! বড় গভীর! ভয় করে!

সে আবার ভাসিয়া উঠিল, সাঁতারিয়া আবার তীরে ফিরিয়া আসিল। তারপর একটা 'জেটি'র উপরে উঠিয়া, আপনার ভিজা দেহকে সটান ছড়াইয়া দিল। তার মরা হইল না। সে চোখ মুদিল। এবং ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘ

কতক্ষণ ঘুমাইল, সে তা জানে না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন তাহাকে ধাক্কা দিতেছে। ধড়্-মড়্ করিয়া, সে উঠিয়া বসিল। দুইহাতে ঘুমঝাপ্সা চোখদুটি কচ্লাইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিল,—চাঁদ পশ্চিম আকাশে।

হঠাৎ পাশ হইতে কে জড়িতস্বরে কহিল, "কি বাবা কুম্ভকর্ণ, ঘুম কি ভাঙ্গল?"

অত্যন্ত চমকিয়া, পাশের দিকে চাহিয়া কুবের দেখিল, আসনপিঁড়ি হইয়া একটা লোক আদুড় গায়ে সেখানে বসিয়া আছে। তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, সে অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

লোকটা বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "কি বাপ্‌ধন, চিন্‌তে পার্‌চ না, কিন্তু আমি তোমায় চিনেচি। তুমি আমারি মত একটা ভবঘুরে। কি বল? নইলে বাবা, এখানে এমন করে ঘরদোর ছেড়ে পড়ে আছ চাঁদ! আমি কে জান? আমার পরিচয়, এই!"

সে একটা জিনিষ উঁচু করিয়া, কুবেরের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল, সেটা মদের বোতল!

"মাতাল!" কুবেরের মুখ দিয়া আচম্‌কা কথাটা বাহির হইয়া গেল। সে সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু লোকটা খপ্‌ করিয়া কুবেরের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "হুঁ, আমি মাতাল। আমি চোর নই, জোচ্চর নই, আমি খুনে নই, বিশ্বাসঘাতক নই,—আমি মাতাল। দুনিয়ার সবাই আমাকে ঠেলে দিয়েছে, তাই আমি মাতাল! যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে আমি মাতাল! একলাটি এখানে ব'সে মদ খাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখে ভাব্‌লুম, যাহোক একটা সঙ্গী জুটে গেল। ব'স, ব'স,—পালিও না—ভয় পাও কেন বন্ধু!"

কুবের আপনার হাত টানিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "ছাড়, ছাড়,—আমি মদ খাই না!"

"মদ খাও না?"

"না। আমায় ছেড়ে দাও,—আর জ্বালার ওপর জ্বালা দিও না,—সারাদিন আজ খাওয়া হয় নি, মাথার ভেতরে আমার আগুন জ্বল্‌চে।"

"আগুন নেবাও দাদা, আগুন নেবাও! এই মদ একটু মুখে ঢেলে দাও, আর দেখবে বুকের আগুন সব নিবে গেছে।"

মাতালের কথাগুলি সমবেদনায় ভরা! এমন আপনজনের মত কথা সে অনেকদিন শোনে নাই। সে আর চলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল না,—আস্তে আস্তে বলিল, "মদে কি প্রাণের কষ্ট যায়?"

"যায় না? বল কি ভাই! এই মদ আছে তাই বেঁচে আছি। নাও, ঢোক্ ক'রে এই এক গেলাস গলায় ঢেলে দাওদিকিন্!"

মাতাল, পাত্রটা আগাইয়া দিল। কুবের অভিভূতের মত দেখিল, পাত্রভরা তরলধারা ঢল ঢল করিতেছে,—লইব, কি, লইব না? এখনও আমি সুচরিত্র। গরীব হইয়া, অনাহারে থাকিয়া, এখনও আমার চরিত্রকে মলিন হইতে দিই নাই,—আর আজ—

"কি বন্ধু! নাও—"

"না, না।"

"সেকি!"

"না, না—ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, আজ তাদের অন্ন জোটে নি। আমি যদি মাতাল হই, তাহলে তাদের কে দেখবে? তারা কি খাবে?"

"তুমি মাতাল না হয়েও, তাদের কি ভাল কর্ত্তে পেরেচ, ধন!"

কুবের ভাবিল, তা বটে!

"নাও হে নাও, জুড়িয়ে গেল! আমার কেমন যে বদ্-স্বভাব, একলা-একলা মদ খেতে পারি নি!—নৈলে, তুমি খেলে না খেলে—আমার কি! নাও, চোখ-মুখ বুজে দাও একটা চুমুক্! দেখবে দেহের মধ্যে যতটুকু এই সুধা যাবে ততটুকু খালি শান্তি!"

লোলুপ—অথচ সভয়নেত্রে, কুবের পাত্রের দিকে চাহিয়া জড়িত জিহ্বায় বলিল, "সত্যি বল্‌চ, মদ খেলে কোন জ্বালা থাকে না ?"

"একদম না। বিশ্বেস না হয়, খেয়ে দেখ। কার জন্যে তুমি ভেবে মর্‌চো ? তোমার মুখ কে চায় দাদা !"

সত্য ! আমার মুখ কে চায় ? আমি মাতাল হই আর না হই— তার জন্যে কার মাথাব্যথা ? তবে আমিই বা মিছা কেন ভাবিয়া সারা হই ?

কুবের কাঁপিতে-কাঁপিতে সুরাপাত্র ধরিল। চোখ মুদিয়া, আপনার শুষ্ক, বিবর্ণ ওষ্ঠের কাছে পাত্রটা তুলিল। তারপর, ধীরে ধীরে কহিল, "কি বল, খাই তা হ'লে —"

"হুঁ হুঁ—সোণারচাঁদ আমার !"

কুবের, পাত্রটা ওষ্ঠপার্শ্বে উপুড় করিয়া দিল,—সেই বিশ্ববিজয়িনী রক্তধারা তাহার উদরস্থ হইল এবং সেইসঙ্গে তাহার অসাড় হস্ত হইতে পাত্রটা স্খলিত হইয়া, সশব্দে পড়িয়া গেল।

"ছিঃ ছিঃ, এ কি কর্‌লে ?" তার মনের ভিতর হইতে কে যেন এই ধিক্কার-বাক্য উচ্চারণ করিল।

অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া, কুবের স্তব্ধভাবে জ্যোৎস্নামাখা অল্পঅস্পষ্ট গঙ্গার চঞ্চল স্রোতের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাতাল, আর এক পাত্র গলায় ঢালিয়া দিয়া গান ধরিল :—

"আনন্দময়ী হয়ে গো মা,
আমায় নিরানন্দ ক'র না—"

গঙ্গার সুনির্জ্জন তটে, নীরবতার মাঝে সে সঙ্গীত বড় গম্ভীর শুনাইল। কুবের কান পাতিয়া গান শুনিতে লাগিল,—তাহার প্রাণমন যেন ভরিয়া উঠিল।

গান থামিল। কুবের আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি কে?"

"বল্লুম ত, তোমারি মত এক হতভাগা।"

"তোমার কেউ নেই?"

"ছিল। সব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচে! থাক্‌বার মধ্যে আছি এখন আমি, আর এই বোতলটা। কিন্তু, তুমি কে?"

"শুনবে?"

"শুনবো বলেই ত জিজ্ঞেস কর্‌লুম।"

দরদের দরদী সবাই চায়। কুবেরও চাহিত, কিন্তু পাইত না। আজ বুঝি পাইয়াছে। এমন করিয়া আর কেহ কখনও তাহাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। তাই সে, প্রাণ খুলিয়া আপনার সকল দুঃখের কথা, এই অপরিচিতের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিল।

মাতাল নীরবে সমস্ত শুনিল। তারপর, নিজে একপাত্র মদ্যপান করিয়া, কুবেরের সুমুখে পাত্রটা আবার ভরিয়া, তুলিয়া ধরিল!

কুবের ভয়ে-ভয়ে বলিল, "আবার!"

মাতাল কহিল, "হু—আবার! খাও, তোমার কথা শুনে বুঝলুম্—এ ভিন্ন তোমার দ্বিতীয় গতি আর নেই। আর একটু খাও, মাথা পরিষ্কার হবে। তখন সাফ্‌ বুঝ্‌বে, এই পৃথিবী তৈরি করাটা মস্ত একটা তামাসা! এখানে গরীবের ঠাঁই নেই বাবা,—তাকে থেৎলে বড়মানুষের হাতী হামেসাই চলে যাচ্ছে। গরীবের মা-বাপ নেই। সে

বাঁচ্ল কি মর্ল কেউ দেখ্বে না।) দেখ্ত, যদি তার টাকা থাকৃত! তা ত নেই! টাকাগুলি যে সব ধনীর সিন্দুকে। এই যে চাঁদ, দেশে এত লেক্‌চারের তুব্ড়ী, এই যে কামরূপে কাক মর্লে কাশীধামে হাহাকার ওঠে,—কিন্তু বাপ্ধন, আমরা গরীবেরা যে রোগে আর অনাহারে, ভুগে আর শুকিয়ে তিলে তিলে মর্‌চি, আমাদের একবার খোঁজটাও কেউ নিতে পার না! আরে ছোঁঃ! সব ভেল্ বাবা, সব ভেল্! কিছু ভেব না,—যত ভাব্না, তত কান্না,—দিন আপনি যাবে,—না যায়, মদ খাও! যতদিন না ওপারে গিয়ে ঠেক্‌চ, মদের গেলাসে দাও চুমুক্,—মস্ত জীবনটা এক্কেবারে ছোট্ট হয়ে যাবে!"

কুবের আর আপত্তি করিল না,—নীরবে মদ্যপান করিল।

হঠাৎ মাতাল তাহার হাত ধরিয়া টানিল; তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ, একটা কথা বলি। টাকার জন্যে যা খুসি করো, কেবল বড়মানুষের কাছে যেও না। গেলে হয় গলাধাক্কা পাবে,—নয় জাঁক্ দ্যাখাবার জন্যে তারা তোমায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু দয়া কর্ব্বে। ভাল মনে টাকা দেবে, তোমার দুঃখে কাতর হয়ে টাকা দেবে,—এমন বড়মানুষ এখন আর পাচ্চ না। বুঝ্লে বাবা, বড়মানুষের ছায়া মাড়িও না—তারা ধাঙড়্। ছুঁলে নাইতে হয়।"

—একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাতাল আবার কহিল, "দেখ, কারুকে বোল না,—আমার ট্যাঁকে বিশেষ কিছু থাকে না,—তবে আজ গোটা তিনেক টাকা আছে দেখ্‌চি, তুমি নাও।"

কুবেরের নেশা হইয়াছে। কিন্তু তখনও তার বোধশক্তি বেশ প্রখর। সে আধ-ঘুমন্ত, আধ-জাগন্তের মত মাতালের দিকে চাহিল,—তাহার মনে

হইল, একি অদ্ভুত মাতাল! যারা মদ খায়, তারা কি এমনি দেবতার মত হয়! তবে লোকে মাতালকে নিন্দা করে কেন?

ইহার পর তিনমাস কাটিয়াছে। কুবের এখন ঘোরতর মদ্যপ। গঙ্গার ধারে, সেই অপূর্ব্ব মাতালের সঙ্গে তাহার রোজ দেখা হইত। মাতাল তাহাকে মদ দিত,—সে আগ্রহভরে পান করিত। পান করিয়া দেখিত, মাতালের কথা ঠিক্। মদ যেন সব জ্বালা ঘুচায়, মদ যেন দুঃখের স্মৃতির ভিতরে সুখের প্রীতি আনে। মদ শান্তির খনি।

মাঝে মাঝে, মাতাল তাহাকে টাকা দিত। কোথা হইতে সে টাকা আনিত, কুবের তাহা জানিত না। মাতালের পরিচয় কি, তাও সে জানিতে পারিত না।

জিজ্ঞাসা করিলে, একই উত্তর পাইত,—"আমি হতভাগা।"

মাতালের দেওয়া টাকায়, কতক সে মদ কিনিত, কতক সরলার হাতে দিত। সরলা, সন্দিগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কহিত, "টাকা কোথা পাও?"

"রোজ্‌গার্ ক'রে আনি।"

"বিশ্বাস ত' হয় না।"

কুবের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিত, "তোমার নাম সরলা রাখ্‌লে কে? তুমি গরলা।"

"তোমারও নাম ত কাঙ্গালীচরণ হওয়া উচিত ছিল; তার বদলে এ নাম কে রাখ্‌লে?"

নিরুত্তর ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের সরিয়া পড়িত। এমনি করিয়া কিছুদিন গেল!

তারপর হঠাৎ একদিন মাতাল কোথায় অদৃশ্য হইল। তাহাকে খুঁজিতে কুবের কোন ঠাঁই বাকি রাখিল না! গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বসিয়া সে রাত ভোর করিল। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাতালের দেখা নাই; যেমন সহসা সে আসিয়াছিল, তেমনি সহসা আবার গা-ঢাকা দিল। কুবের চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আরও কয়েকদিন কাটিল,—মাতাল আসিল না। কুবেরের সংসারে দারিদ্র্য এবং অনাহার, আবার আত্মপ্রকাশ করিল। এবারকার অভাবকষ্ট আরও অসহ্য! মদ কৈ? ভাত না পাই, ক্ষতি নাই—কিন্তু মদ, মদ কৈ? মাতাল কোথায়,—কে আমার শুক্‌নো গলায় মদ ঢালিয়া দিবে,—কে আমার বুক থেকে দারিদ্র্যের আগুন নিবাইয়া দিবে? আমি মদ খাব গো—সব জ্বালা ভুলিব। দাও মদ!

সরলা সামনে আসিল। বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিল, "ওগো রোজগেরে মানুষ! ঘরে যে হাঁড়ি চড়্‌চে না! টাকা কোথা—"

"চুপ!" কুবের কর্কশকণ্ঠে বাধা দিল।

তাহার তেমন স্বর সরলা আর কখনও শুনে নাই। থতমত খাইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

"সরে যাও,—সরে যাও বলচি! সর্‌লে না? দেখবে—"

কুবের দুইহাতে ঘুষি পাকাইল। সরলা আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিল না।

মদ্! মদ্! মদ্! ব্যাস্—কিছু আর চাই না আমি! খালি ঢাল্‌ব

আর থাব, থাব আর ঢাল্‌ব! সংসার যাক্ ভেসে,—কে কার বাবা? চোখ্ বুজ্‌লেই অন্ধকার—যতক্ষণ চেয়ে আছি—মদ, খালি মদ, খালি মদ চাই!

"বাবা!"—কুবেরের ছেলে আসিয়া কাতরস্বরে ডাকিল। দুধের ছেলে,—ভাল করিয়া এখনও কথা ফোটে নাই। এই বয়সে অনাহারে অযত্নে তার চোখ্ বসিয়া গিয়াছে, পেট পড়িয়া গিয়াছে।

"বাবা?"

"কি চাস্?"

"বাবা গো, ক্ষিদে!"

"হুঁ, ক্ষিদে! ওরে হতভাগা, আমায় খাবি; মদ খাবি?"

"বাবা গো!"

"চোপ্‌রাও!"

শিশু, ভয়ে এতটুকু হইয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে পলাইয়া গেল।

কুবের দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ পলায়নপর পুত্রকে দেখিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল,—ধরিয়া কোলে তুলিয়া নিল।

"ওরে যাদু—ওরে খোকা! আমি তোর বাপ নই! বাপ হলে, ছেলেকে খেতে দেবার ক্ষমতা থাকৃত। ভগবান্, মুখ তুলে চাও, দেখ, এখনও তোমার নাম ভুলিনি—এখনও তোমায় ডাক্‌চি!"

খোকার বুকে মুখ রাখিয়া কুবের কাঁদিতে লগিল।

কাঁদিতে-কাঁদিতে হঠাৎ কান্না থামাইয়া সে মুখ তুলিল। আপন মনে বলিল, "একি, কাঁদচি কেন? কাঁদলে কি মদ পাওয়া যায়? আরে দূর্—আরে দূর্! তুই আমার কোলে কেন? যাঃ—দূর্ হ!"

খোকাকে নামাইয়া দিয়া এলমেল পায়ে কুবের ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় গেল।

চ

রাস্তার মোড়ে মদের দোকান। সেখানে মাতালদের আনন্দোৎসব হইতেছে। কেহ মাটির গেলাসে মদ নিয়া নাচিতেছে, কেহ ভূতলে লম্বা হইয়া পড়িয়া গান সুরু করিয়া দিয়াছে, কেহ হাসিতে-হাসিতে হঠাৎ অকারণে কাঁদিয়া ফেলিতেছে, কেহ-বা আকস্মিক ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বিকটস্বরে 'তারা' 'তারা' বলিয়া চ্যাচাইয়া উঠিতেছে।

কুবের লোলুপ দৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সকলের মদ্যপান দেখিতে লাগিল। শেষটা আর থাকিতে পারিল না, আস্তে-আস্তে দোকানের ভিতরে ঢুকিয়া 'শুঁড়ি'কে গিয়া বলিল, "হ্যাগো, একটু মদ দেবে ?"

"পয়সা ?"

"আজকের দিনটা ধারে দাও, পয়সা কাল পাবে।"

"না, না—দোকানের দরজায় কি লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছিস্ না ? 'ধারে বিক্রয় নিষেধ'—ঐ ত্থাখ্!"

"একটুখানি দাও না, পায়ে পড়ি!"

"আরে খোলো, কোত্থেকে এ আপদ এসে জুটল! যা যা—মদ খেতে পয়সা লাগে, পয়সা আন্‌গে যা!"

শুঁড়ির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ঘরসুদ্ধ মাতাল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "যা, যা—মদ খেতে পয়সা লাগে, পয়সা আন্‌গে যা।"

কুবের দোকান হইতে বাহির হইল। একবার এ রাস্তা, একবার

ও রাস্তা—এমনি লক্ষ্যহীনভাবে সারাদিন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার আগে, তাহার শরীর একেবারে এলাইয়া পড়িল। সে আর চলিতে পারিল না। রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর বিলাতী মাটীর ঠাণ্ডা রোয়াকের উপরে সে আস্তে-আস্তে দেওয়ালে ঠেশ্ দিয়া বসিয়া পড়িল। এবং সেই অবস্থায়, খানিক বসিয়া থাকিতে-থাকিতে তার চোখ ঘুমে ভারি হইয়া আসিল।

তন্দ্রাটা সবে একটু ঘোরালো হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ কে তাহার গলা ধরিয়া একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া দিল। অত্যন্ত চমকিয়া কুবের চাহিয়া দেখিল, তাহার সামনে লালপাগ্ড়ীর মটুক্ পরিয়া, কালো দাড়ীর মেঘে চক্‌চকে দাঁতের বিদ্যুৎ খেলাইয়া, এক কনষ্টেবলের মূর্ত্তি! সংপ্রতি পাড়ায় উপরি-উপরি কতগুলি চুরি হওয়াতে উপরওয়ালার কাছে ধমক খাইয়া, পাহারাওয়ালাজী, সুচতুর চোরের উপরে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন! কাজেই, কুবেরকে এখানে, এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ইহার মৎলব নিশ্চয় খারাপ! অতএব, তিনি মহাবিক্রমে হতভাগ্য কুবেরের ঘাড়্ ধরিয়া, তাহাকে রোয়াকের উপর হইতে নামাইয়া দিয়া, সহরের যাবতীয় চোরের উদ্দেশে এমন কতগুলি সুমধুর শব্দপ্রয়োগ করিলেন, যাহা কোন অভিধানে পাওয়া যায় না বা ভাষায় লিখিয়া দশজনকে তাহা শুনাইতে গেলেও—ভদ্রসমাজে লেখকের "কুল্‌কে" পাওয়া দায় হইয়া উঠিবে!

"ভগবান, গরীবের—ঘরেও জ্বালা, পরেও জ্বালা, এ জীবন নিয়ে কি কর্ব্ব তবে? কোথা যাব? ওঃ! আর পারি না—আর পারি না—তবু প্রাণ যায় না! ছার প্রাণ!"

কুবের একটা গলির ভিতরে ঢুকিল। চোখের জল মুছিতে-মুছিতে অসাড় পায়ে একদিকে ধীরে ধীরে আপনমনে চলিয়া গেল।

ছ

মানুষের প্রাণ ত! সারাদিন পেটে ভাত নাই, বুকের ভিতরে অশান্তির আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে,—কত আর সওয়া যায়? দুপা হাঁটিয়াই কুবেরের দেহের ভিতর কেমন করিতে লাগিল,—মস্তিষ্ক যেন অগ্নিপিণ্ড!

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চলিতে-চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার মনে হইতে লাগিল, পায়ের তলা থেকে মাটী যেন সরিয়া যাইতেছে, বুকের ভিতরে প্রাণ যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি একটা বাড়ীর দেওয়ালে গা-ঠেসান্ দিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার কাতর চোখদুটি মার্জ্জনা করিল। মনে-মনে বলিল, "আর যেন চোখ্ না খুল্‌তে হয়,—আর যেন চোখ্ না খুল্‌তে হয়!"

কিন্তু, মৃত্যু কোথায়? অনাদৃত হতভাগ্য মরে না! কুবেরও মরিল না! তেমনি করিয়া দেওয়ালে ভর্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কতকক্ষণ, সে জানে না।

হঠাৎ কচি-কচি গলায়-কে মধুর স্বরে ডাকিল, "ভিখিলি. অ ভিখিলি!"

কুবের, ধীরে-ধীরে চক্ষু মেলিল। দেখিল, তার পাশেই একটি বাড়ীর দরজা। সেখানে, চৌকাঠের উপরে দাঁড়াইয়া, কোঁকড়া-চুলে ঢেউ খেলাইয়া গোলাপ ফুলের মত একটি ছোট্ট মেয়ে।

তাহাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া, মেয়েটি তাহার কাছে আসিয়া

দাঁড়াইল। বড়-বড় ডাগর চোখে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিয়া, সে আবার কথা কহিল, "ভিখিলি, তোমাল কি হয়েচে?"

কি মিষ্ট কথা!

অন্য সময় হইলে, কুবের হয়ত এই অবোধ শিশুর কথা তুচ্ছজ্ঞান করিত,—কিন্তু তখন তাহার পাত্রপাত্রীর ভেদজ্ঞান মোটেই ছিল না! উচ্চস্থান হইতে পতনকালে, মানুষ দুহাত বাড়াইয়া শূন্যকেও জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করে।

অতএব ক্ষীণকণ্ঠে কুবের কহিল, "আমি খেতে পাই নি।"

"পয়তা নেবে?"

"নেব।"

সে ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। কুবের দেখিল, তাহার গলায় কি চক্-চক্ করিয়া উঠিল। কি ওটা? হার? সোণার হার!

তাহার মুখ বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সকল মানুষেরই বুকের একদিকে ভগবান্ আর একদিকে সয়তান থাকে। একদিকে সৎবৃত্তি, আর একদিকে পিশাচবৃত্তি। কঠিন সমাজ-শাসনে, শিক্ষাগুণে, সৎবৃত্তির অনুশীলনে, সেই পিশাচবৃত্তিগুলি সাড়া দিবার ফাঁক্ পায় না।

কিন্তু, "অবস্থাভেদে মানব পশুমাত্র।" চারিদিকে যার অভাব, তার সৎস্বভাব জলের আল্পনার মত পুঁছিয়া যায়, এবং সেইসঙ্গে মনের জ্ঞান-প্রদীপও নিবিয়া যায়।

কুবেরের মনের আলো এখন নিবিয়াছে। অন্ধকারে সেথানে সয়তান জাগিয়াছে।

মাথাহেঁট করিয়া, সে ভাবিতে লাগিল, "সোণার হার! সোণার—! কত দাম? কুড়ি টাকা? পনেরো টাকা? দশ টাকা? হুঁঃ! দশ টাকা এখন যদি পাই, কি করি? আগে মদ কিনি। তারপর! বাড়ীতে কিছু দি! ছেলে-মেয়ে খেতে পায় নি। তারা কাঁদ্‌চে, হয়ত মরে গেছে। মরে গেছে? আশ্চর্য্য কি? সোণার হার!

কুবের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেউ কোথাও নাই। ঐযে,—মেয়েটা আস্‌চে না? বেশ মেয়েটি! দেখ্‌লে মায়া হয়।

হুঁ—মায়া! কিসের মায়া? আমাকে দেখে কেউত মায়াদয়া করে নি! কিসের মায়া? ঐ যে,—

গলায় হারটা তুলচে। সোণার হার! নিয়ে যদি পালাই, কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

না—না—না! কি চমৎকার মুখ! আমাকে দেখে ওর দয়া হয়েছে,—আর, আমি ওর ওপরে ডাকাতি কর্ব্ব? তা কি হয়! কিন্তু, আমি যে মরি—আমার স্ত্রী-পুত্র যে মরে! মদ না পেলে আমি বাঁচ্‌ব না,—খেতে না পেলে তারা বাঁচ্‌বে না। সোণার হার! কি করি? তাইত—কি করি?

এমন সময়ে মেয়েটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ভয় মুখে তাহার সরল হাসির লীলা। ননীর মত একখানি নরম হাতে সে কুবেরের হাত ধরিয়া, অন্যহাতে একটি পয়সা দেখাইয়া, বাঁশীর মত মিঠে আধো-আধো স্বরে বলিল, "ভিখিলি,—মা পয়তা দিয়েতে।"

কুবেরের দৃষ্টি, হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি, কোন বুভুক্ষু শ্বাপদের মত ভয়ানক। সে প্রথমে শিশুর গলার হারের দিকে চাহিল।

কি প্রদীপ্ত স্বর্ণ! তারপর তাহার চোখ, মেয়েটির চোখের উপরে পড়িল। কি নির্দ্দোষ দৃষ্টি! শিশুর কোমল চাহনির সামনে, বুঝি পাষাণেও দরিয়া বহে! সেই নিষ্পাপ, শুভ্র আত্মার মহিমার সুমুখে কুবেরের মনের কুভাব যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাহাকে বাঁচিতেই হইবে, চুরি করিতেই হইবে! সে জোর করিয়া প্রাণপণে আপনার চোখ মুদিয়া রহিল। যেন শিশুর মায়াময় দৃষ্টি, তাহাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে টলাইতে না পারে! তাহার পর হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়া, মনকে কঠিন করিয়া পলক-না-পালটিতে দুইহাতে সে, সেই স্বর্ণহার চাপিয়া ধরিল।

ছোট মেয়েটির মুখ ভয়ে সাদা হইয়া গেল। সে কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

দন্তে-দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কুবের চাপাগলায় কহিল, "চুপ্। কাঁদিস্‌নে। মেরে ফেলব—মেরে ফেলব।"

মেয়েটি, আপনার মোমের মত নরম হাতদুখানি দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার কাপড়ের ভিতরে আপনার কচি মুখখানি গুঁজিয়া ফুপাইতে ফুপাইতে আধো-আধো স্বরে কহিল, "অ ভিখিলি, মাল্‌বে কেন ভাই, আমি তোমায় কত ভালবাতব—পয়তা দেব!"

কুবেরের দম্ যেন আট্‌কাইয়া যাইবার মত হইল। থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে, মেয়েটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া সে কহিল, "ভাল-বাস্‌বি? আমায় তুই ভালবাস্‌বি? অ্যাঁ! বলিস্ কিরে?"

"ভালবাতব—খুব ভালবাতব! আমায় মেল' না ভাই।"

"নাঃ!"

কুবেরের শিথিল মুষ্টি হইতে হারছড়া পথের উপরে পড়িয়া গেল ! এবং সেইসঙ্গে সে'ও একান্ত অবসন্ন হইয়া, মরণাহতের মত মাটির উপরে গড়াইয়া পড়িল। তাহার চেতনা লুপ্ত হইল।

* * * *

যখন তাহার জ্ঞান হইল দেখিল, তাহাকে ঘিরিয়া অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমটা সে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, স্বপ্ন দেখিতেছি।

হঠাৎ একজন বলিল, "আবার মট্‌কা মেরে পড়ে আছেন ! ওঠ্‌ ব্যাটা ওঠ্‌ !"

সে আস্তে-আস্তে উঠিয়া বসিল। একি ! এরা কারা ?

আর একজন বলিল, "ব্যাটা চোর, মেয়েটাকে আর একটু হ'লে মেরে ফেলেছিল আর-কি ! ভাগ্যে আমি দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এলুম ! পাহারাওলাজী, নিয়ে যাও ব্যাটাকে থানায়।"

পাহারাওয়ালা সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া কুবেরকে রুলের এক গুঁতা দিয়া কহিল, "শালা বদ্‌মাস্‌ ! উঠ্‌ শালা উঠ্‌।"

জ

এক বৎসরের কারাবাস ! সেযে কি যন্ত্রণা ! স্বাধীন তাহা বুঝিবে না। আর, বুঝিবে না বলিয়া অভাগার সেই দৈনন্দিন যাতনাকাহিনী এখানে বলিয়া লাভ নাই। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি বুঝিয়া লউন।

এক বৎসর পরে, একদিন কুবের হঠাৎ দেখিল, চির-পরিচিত, দুঃখ-সুখের স্মৃতি-দিয়া-ঘেরা, বিশাল বাহ্যজগৎ, আবার তাহার মস্তকে অনাহত

আলোক-আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছে। পিছনে কারাগার, আপনার আন্ধিয়ার হৃদয়ের উপরে আবার রুদ্ধ লৌহ কবাটের আবরণ দিয়াছে। কুবের দুইহাতে আপনার চোখ কচ্‌লাইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে-যেন একটা সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে!

সে চলিল। কারাগারের সংকীর্ণতায় তাহার প্রাণ যেন এতদিন জড় হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সহসা এই অবাধ স্বাধীনতার ভিতরে, এই অজস্রবৃষ্ট সূর্য্যকরধারার মাঝে পড়িয়া আবার সে দেখিল, চারিদিকে নূতন জীবন, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ,—আলো, আর গান, আর হাসি!

সেই সংসার! সেই মানুষ! সংসারে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, মানুষের উপরে তাহার ঘৃণা হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, এতদিন সে প্রবাসে, পরের কাছে পড়িয়া ছিল,—এই সংসার যে তাহার আপন ঘর, এই মানুষ যে তাহার আপন ভাই! আজ যেন বিশ্বের নিখিল আনন্দ, পুষ্পের নিখিল গন্ধ, সংসারের নিখিল ভালবাসা, শরীরী হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে!—নবলব্ধ মুক্ত স্বাধীনতার প্রেরণায় সে-যেন পাগল হইয়া উঠিল! ভাবিল, উচ্চে—আরও উচ্চে, ঐ যে নীলাঞ্জনীল নিথর আকাশ বিরাট্ অসীমতা এবং মৌনব্রত লইয়া অনাদিকাল ধরিয়া পড়িয়া আছে, সে যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, মাথার উপরকার ঐ অসীমতাকে এখনই আপনার মুঠোর ভিতরে চাপিয়া ধরিতে পারে! সে এখন স্বাধীন—সে এখন স্বাধীন!

এখন কি করিব, কোথায় যাইব? কেন, আপন আলয়ে? যেখানে

আমার স্ত্রী আছে, আমার রক্ত-দিয়ে-গড়া পুলকের দুলালগুলি আছে! আহা, বাছারা না জানি "বাবা, বাবা" বলিয়া কত ডাকিয়াছে—কত কাঁদিয়াছে! ওরে আনন্দের কণা, মাণিকের টুক্‌রা, ওরে, তোদের কি আমি ভুলিতে পারি?—এই যে, এখনি গিয়া কোলে করিব, চুমা খাইব। আর সরলা? এতদিনের অদর্শনে নিশ্চয়ই তাহার মুখরতা দূর হইয়াছে।

আচ্ছা, তারপর? তারপর আর কি? 'জেলার' সাহেব আমাকে ভালবাসিতেন। আসিবার সময়ে, আমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছেন। আপাতত, ইহাতেই ত কিছুদিন চলিবে। ইহার ভিতরে একটা কাজের যোগাড় নিশ্চয়ই করিয়া লইব। এত কষ্ট পাইলাম, ভগবান্ এখনও কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? আমি ত' তাঁকে এখনও ভুলি নাই!

আমি চোর, আমায় কে কাজ দিবে? আমি চোর? কখনো না! ভগবান্ সাক্ষী, আমি চুরি করি নাই! বেশ,—কাজ না পাই, এবার দিন-মজুরী করিয়া খাইব!

এমনি নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে, সে আপনার বাসাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু, কোথায় সরলা,—কোথায় ছেলেমেয়ে? দরজা যে বাহির হইতে বন্ধ! পাড়ার অনেকের কাছে সে খোঁজ নিল। কিন্তু সরলার সন্ধান কেহ দিতে পারিল না।

ওহো,—ঠিক্! সরলা নিশ্চয় তার ভায়ের কাছে গিয়াছে! এখানে একলাটি সে থাকিবে কেমন করিয়া? কে তাদের সংসার চালাইবে? হ্যাঁ, সেই ঠিককথা। সরলা তার ভায়ের কাছে গিয়াছে।

সরলার ভ্রাতার উদ্দেশে সে ছুটিল। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল, সরলা সেখানে যায় নাই। তাহার ভ্রাতাও পরলোকে।

সরলা—আমার ছেলে—আমার মেয়ে!

কুবেরের মাথাটা যেন হঠাৎ কেমন গরম হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অনেক ভাবিল,—সরলা কোথায় গেল? মরিয়া গিয়াছে? তার ছেলে—তার মেয়ে? তারাও মরিয়াছে? সবাই মরিয়াছে? স্ত্রী—পুত্র—কন্যা,—ভগবান্—ভগবান্!

কুবের পাগলের মত একদিকে ছুটিয়া চলিল। সংসার আবার অন্ধকার, ভীষণ, শূন্যতাপূর্ণ!

যাইতে-যাইতে হঠাৎ দেখিল, পথের ধারে শুঁড়িখানা।

নিরাশায় আবার তাহার প্রাণে সয়তান জাগিল। এতক্ষণ সে ছিল, মুক্ত তুরঙ্গের মত! এখন, যেন কোন অজ্ঞাতকরধৃত অদৃশ্য রজ্জু, তাহাকে এক বিপুল অন্ধকারের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কুবের, আত্মসংযম করিতে পারিল না। একটুও আগুপিছু না ভাবিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত, সে বরাবর মদের দোকানের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। হাতে 'জেলার' সাহেবের দেওয়া সেই কুড়ি টাকার নোট। ভাবিল, মদ খাই—সব দুশ্চিন্তা দূর হইবে।

সমস্তদিন সে, মদের দোকানে একদল মাতালের সঙ্গে পড়িয়া রহিল। মদ খাইয়া, পৈশাচিক আনন্দে ডুবিয়া, সে সকল দুর্ভাবনা ভুলিল।

সন্ধ্যার আগে, দলের একটা মাতাল কহিল, "খালি মদে বাবা, ফুর্ত্তি হয় না। দু'চারখানা মিঠে গলার গান, তার সঙ্গে নাচ আর তবলায়

চাঁটি,—তবে ত' ফুর্ত্তি জম্‌বে। চল বাপসকল, এ আলুনি নেশায় যার খুসি হয়, থাকুক,—এর মধ্যে আমি নেই ভাই!”

সকলের আগে কুবের দাঁড়াইয়া উঠিল; কহিল, “ঠিক্ বলেচ, চল।”

ঝ

তাহারা একটা জঘন্য পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

দুপাশে সারি-সারি খোলার ঘর। রোয়াকের উপরে কতকগুলা কুৎসিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। তাহাদের মুখে খড়ি মাখা। রাত্‌জাগা বসা-চোখের আসেপাশে কাজলআঁকা। তাহাদের ম্লানদৃষ্টিতে কামের গন্ধমাত্র নাই,—আছে সুধু অভাবের মৌন হাহাকার, দারিদ্র্যের নীরব যাতনা! অন্ধকারে বসিয়া, হাঁটুর উপরে মলিন মুখ রাখিয়া, দুরন্ত শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় তাহারা থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া মরিতেছে।

মাতালদের সঙ্গে কুবের গলির ভিতরে ঢুকিল। মাতালেরা সবাই উল্লসিত, কিন্তু কুবেরের মুখে কোনরূপ ভাবাবেশ নাই। তুফানের টানে সে তখন হালভাঙ্গা নৌকার মত। তাহার কোন ভাবনা নাই!

সে চলিয়াছে, চলিয়াছে,—সংসারস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায় গিয়া, কোন্ কূলে আছাড়িয়া তাহার ভাসিয়া চলার অবসান—সে তা জানে না, জানিতে চাহে না!

অন্ধকারের ভিতর হইতে আচম্‌কা একটা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল। মিনতি করিয়া বলিল, “আমার ঘরে আসবে গা?”

হঠাৎ, কে-যেন চুলের মুঠি ধরিয়া কুবেরের হেঁট্‌করা মুখ সিধা করিয়া দিল। কে ডাকে,—এ কার গলা? তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রমণীর সহিত মিলিয়া স্থির হইল—ক্ষণিকের জন্য। এক পলকের ভিতরে তাহার মুখের মাংসপেশীর বিবিধরূপ পরিবর্ত্তন হইল। এবং পরপলকে তাহার মাথা, মড়ার মত কাঁধের উপরে ঝুলিয়া পড়িল।

রমণীও প্রথমে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর; দুহাতে প্রাণপণে আপনার মুখ ঢাকিয়া, বেগে পলায়ন করিল। যেন, সে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিয়াছে।

কুবেরকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া, একজন তাহার গা-ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "ও হে, দাঁড়িয়ে পড়্‌লে যে! চল না!"

তাহাদের ডাকে কুবের শিহরিয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। একবার সামনের অন্ধকারের দিকে চাহিল। কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিল। যেন মনের ভিতরে, কি-একটা পুরাণো কথা হারাইয়া গিয়াছে, আর খোজ মিলিতেছে না। যেন স্মৃতির সূতা মাঝ্‌খানে কোথায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আর জোড়া লাগিতেছে না!

মাতালেরা হাঁকিল, "তুমি কি-রকম বদ্‌রসিক হে! যাবে, কি যাবে না বল?"

সহসা উচ্চ, বিকট হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া কুবের চেঁচাইয়া উঠিল, "কোথা যাব,—সরলার বাড়ী? হাঃ হাঃ! সরলার বাড়ী!"

অন্ধ

ক

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

কি বল্‌চেন ?—হাস্‌চি কেন ? হুঃ— হাস্‌চি কেন !—কে জানে ! হয়ত' কাঁদ্‌তে পার্‌চি না বলেই হাস্‌চি ! আমার বুকের ভিতরে বালির চড়া পড়ে গেছে কিনা ! সব জল শুকিয়ে গেছে গো, শুকিয়ে গেছে। চোখ দিয়ে তাই আর জল আসে না। আমি কান্নার বদলে তাই স্রধু হাস্‌চি আর হাস্‌চি !

—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। বাবা ত' কিছুতেই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। আমার হয়ে বল্‌তে গিয়ে উল্টে মা তাঁর কাছে ধমক খেলেন।

বাবা বল্লেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কখনো চোখেও দেখেনি। মেয়ে অন্ধ, তা হয়েচে কি ! এতগুলো টাকা কি ছাড়া যায় ?"

মেয়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না, বাবাও পঞ্চাশ হাজার টাকা কখনো চোখে দেখেন নি। বিয়ে হলে মেয়ে যদিও চোখে দেখ্‌তে পাবে না,

কিন্তু বাবাত, এতগুলো টাকা চোখে দেখ্‌তে পাবেন !—ব্যস, তাহলেই হল, তাহলেই হল ! তাঁকে টাকা ছাখাবার জন্যে আমাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে।

মা বড় অবুঝ। স্ত্রীলোক কিনা! বল্লেন, "তবু ছেলেটার দিকেও ত' একবার তাকাতে হয় !"

বাবা রেগে বল্লেন, "ভগবান্ যাকে মেরেচেন, আগে তার দিকে তাকানো উচিত! জান সে অন্ধ!"

হাঃ হাঃ—বাবার কি ধর্ম্মজ্ঞান! কিন্তু বাবা আমার এ সহজ কথাটা ইচ্ছে করেই বুঝলেন না যে, ভগবান্ যাকে মেরেচেন, তুনিয়ায় আমি ছাড়া তার দিকে তাকাবার জন্যে আরও ঢের লোক আছে। এ বাঙ্গলা যে দয়ায় ভরা! পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারলে এখানে অন্ধ হলেও বিয়ে বন্ধ থাকে না; বাঙ্গালী বরের বাপ টাকা পেলে চিতা থেকেও মরা মেয়েকে ছাঁদ্‌নাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে!

বাবা আবার বল্লেন, "আমার যদি বয়স থাক্‌তো, এ মেয়েকে তাহলে আমিই বিয়ে—"

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লেন, "চুপ কর, চুপ কর! কি বল্‌চ তুমি!"

বাবা ঠিক্‌ই বল্‌চেন। তুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক করেন, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে রাখেন, ভগবান্ যাকে মেরেচেন তার দিকে তিনি তাকাবেন না?

হাঃ হাঃ?—

আমারও,—তাতে আপত্তি ছিল না।

খ

দুঃখের কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকা চোখে দ্যাখ্‌বার অবকাশ বাবা বেশীদিন পেলেন না। মৃত্যু এসে আমার এই অন্ধবধূর মত বাবাকেও অন্ধ করে অন্ধকারে নিয়ে গেল। জানি না, ইহলোকের এই পঞ্চাশ হাজার টাকার আওয়াজ তিনি তাঁর বৈতরণীর পরপার থেকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা।

হাঃ হাঃ!—আর, আর—আমার এই হাসির শব্দ! এও কি তাঁর কাণে যাচ্ছে? এ হাসির শব্দ কি তাঁর বুকের হাড়ে-হাড়ে, তাঁর পাঁজরে-পাঁজরে গিয়ে ঘা মার্‌চে, মার্‌চে, মার্‌চে? আমি এটা জান্‌তে চাই। কেউ বল্‌তে পার?

বেণু সুধু অন্ধ নয়। ভগবান্ তাকে অন্ধকারের মত কালো করে, আমার মুখের সামনে বিষের পাত্র পূর্ণ করে রেখেছেন।

কিন্তু তার নাম রাখ্‌লে কে? নামের এমন সার্থকতা আমি আর কখনো দেখিনি! আশ্চর্য্য! তার সমস্ত রূপের অভাব, চোখের অভাব যেন এই মধুর, কোমল অথচ বিষাদমাখা স্বরের ভিতরে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিন্তু, সে অন্ধ। সে কালো। তার দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হোত, আমার রাগ হোত। আপনার চির-অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে কেন সে আমার জীবনকেও অন্ধকার করে দিলে? কেন দিলে—কেন?

সে, বাড়ীর অন্য-অন্য সকলকার পায়ের শব্দের ভিতর থেকে আমার পায়ের শব্দ ঠিক চিনে নিতে পারত। এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেচি। আমার পদশব্দ শুন্‌লেই সে মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে থাকৃত। কিন্তু, আমি

যে তাকে ঘৃণা করি, এটা সে বুঝ্‌তে পার্‌ত। কারণ, আমি তাঁর কাছে গেলে সে সরে যেত। নয়ত কেমন-যেন জড়সড় হয়ে দোষীর মত বসে থাক্‌ত। আর এক আশ্চর্য্যের কথা, আমার সঙ্গে এতদিন সে একটাও কথা বলে নি। এক অন্ধ, অন্ধকার মৌনের মত, সে আমার প্রাণমনের উপরে চেপে বসেছিল।

তাকে কথা কওয়াবার জন্যে আমিও কিছু ব্যস্ত ছিলাম না। আমিও তার সঙ্গে কথা কই নি।

এমনিভাবে একবছর গেল। এই একবছর আমরা কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা কই নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন নীরবতা যে থাক্‌তে পারে, আগে আমার এ জ্ঞান ছিল না। ওঃ! তোমরা এ কল্পনা কর্‌তে পার্‌বে না। এ নীরবতা অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য!—হ্যাঁ, অসহ্য বটে,—তবু এ নীরবতা ভঙ্গ কর্‌বার সাহস আমাদের কারুর ছিল না।

গ

আমি জীবনটাকে উপভোগ কর্‌ছিলাম।

আমার যৌবনের ভিতরে অনেকখানি ফাঁক্‌ থেকে গিয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যার পূর্ণ যৌবনের তপ্ত রক্তধারা অপব্যয় হয়, তার কষ্ট সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, ক্ষতিপূরণ কর। লোহার সিন্ধুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ মজুৎ রেখে, বাবা (অনিচ্ছাসত্ত্বে কিনা, জানি না!) পরলোকে প্রস্থান করেছিলেন।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিন্ধুকের চাবীটি তিনি ট্যাঁকে করে নিয়ে যেতে পারেন নি।

সেই পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমি আমার জীবনের ফাঁক্‌টুকু ভরিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। প্রায়ই আমার বৈঠকখানায় বাইজীর "হিলি-মিলি-পানিয়া"র সঙ্গে মদের পিয়ালায় ঠিনি-ঠিনি সুর বেজে উঠ্‌তে সুরু হোল। ফলে, আমার জীবনের ফাঁক্‌টুকু যতই ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বাবার লোহার সিন্ধুকও ক্রমে ততই খালি হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

বেণুর চোখ ছিল না, কিন্তু কাণ ছিল। সে কিছু দেখ্‌তে না পেলেও শুন্‌তে পেত সব। আমাকে মুখ ফুটে কিছু না বল্লেও, তার মনে যে ঝড় উঠেচে, এটা আমি তার মুখ দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু, বুঝেও আমার প্রাণে দয়া হোত না,—বরং একটা নিষ্ঠুর আনন্দের ভাব জেগে উঠ্‌ত।

রাত্রে আমি প্রায়ই বাড়ীতে থাক্‌তাম না। বাড়ীতে থাক্‌লেও বেণুর কাছে যেতাম না। তার প্রতি আমার ঘৃণা ও রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল।

সেদিন হঠাৎ আমার জ্বর হোল। বাইরের ঘরে জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর, কখন-যে আমার প্রাণের ইয়ারেরা আমার কাছে থাকাটা অনাবশ্যক মনে করে আস্তে-আস্তে সরে পড়েছিল, আর কখন-যে চাকরেরা আমাকে ধরাধরি করে অন্দরে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল, সে খেয়াল আমার আদোপেই ছিল না।

* * * *

স্তব্ধ রাত্রে, ঘরের ঘড়ীটা হঠাৎ বেজে উঠল। সেই শব্দে আমার জ্ঞান হোল। আমি শুন্‌লাম একটা, দুটো, তিনটে, চারটে! শেষরাতের

থম্‌থমে নিস্তব্ধতাকে অকস্মাৎ জাগ্রৎ করে দিয়ে ঘড়ীটা আবার থেমে গেল। কেবল, রজনীর হৃৎপিণ্ডের শব্দের মত, সেই চির-জাগন্ত ঘড়ীটা ক্রমাগত মৃদুস্বরে কর্‌তে লাগ্‌ল, টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌!

মনে হোল, কে-যেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,—খুব আল্‌ত-ভাবে। আমার মাথার ভিতরটা তখন জ্বলে-পুড়ে যেন থাক্‌ হয়ে যাচ্ছিল,—কে আমার সেবা কর্‌চে সে কথা আমি বুঝতেও পার্‌লাম না, বুঝবার চেষ্টাও কর্‌লাম না।

"বড় তেষ্টা—একটু জল।"

আমার মুখের কাছে কে জলের গেলাস ধর্‌লে।

জলপান করে আমি অনেকক্ষণ শুয়ে রৈলাম। অন্ধকারে দেখতে পেলাম না,—কিন্তু, কে আমাকে পাখার বাতাস কর্‌ছিল।

*　　*　　*　　*

হঠাৎ আমার কপালে দু-ফোঁটা জল পড়্‌ল। এ কিসের জল? আবার,—এক, দুই, তিন ফোঁটা! একফোঁটা আমার ঠোঁটে পড়্‌ল, —বুঝলাম, সে চোখের জল! এই রাতে আমার শিয়রে বসে কাঁদে কে?

তখন, একজনকে মনে হোল। হ্যাঁ,—একজনকে! কিন্তু—কিন্তু, কেন কাঁদে সে?

পীড়ায় বোধ করি, মানুষের মনকে পল্‌কা করে ফেলে। নইলে, ক-ফোঁটা অশ্রুজলে আমার অমন পাথরের মত মন ভিজে নরম হয়ে গেল কেন?

আস্তে আস্তে ডাক্‌লাম, "বেণু?"

উত্তর পেলাম না।

"বেণু ?"

পাখার হাওয়া থেমে গেল।

"বেণু কথা কও!"

অতি মৃদু—কম্পিত স্বরে উত্তর পেলাম, "কি বল্‌চ ?"

"তুমি কাঁদ্‌চ কেন ?'

"কাঁদি নি।"

"মিছে কথা বোল না।"

ভয়ে-ভয়ে বাধো-বাধো গলায় বেণু বল্‌লে, "আর,—আর কাঁদ্‌ব না।"

আমি চুপ করে রৈলাম। তখন কি ভাবছিলাম, তা আর আমার মনে নেই।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ কেন ?"

"তোমার যে জ্বর হয়েচে !"

"আমার জ্বর, তাতে তোমার কি ?"

উত্তর পেলাম না। তার বদলে আমার কপালে দু-ফোঁটা জল পড়্‌ল। যে চোখে দৃষ্টি নেই, সে চোখেও ব্যথার অশ্রু থাকে! ভগবান! দু-বিন্দু অশ্রু মনের কথা এমন করে খুলে বল্‌তে পারে ?

আমার মনটা কি-রকম হয়ে গেল,—আমি দুহাত বাড়িয়ে বেণুকে আমার বুকের উপরে টেনে নিলাম। তার মুখে আমার মুখ রেখে চুম্বন করলাম। বেণু অস্ফুটস্বরে কি বল্‌লে। তার সারা দেহ থর্‌থর্ করে একবার কেঁপে উঠল। তার মাথাটি আমার কাঁধের উপরে এলিয়ে

পড়্‌ল। তারপর, প্রাণপণে আমার বুক দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে থির হয়ে পড়ে রৈল।

* * *

প্রতঃসন্ধ্যার স্তব্ধ চিতা যখন পূর্ব্বমেঘে জ্বলে উঠল, তখন তার আলো বেণুর অন্ধনেত্রে, কৃষ্ণদেহের উপরে এসে পড়্‌ল।

অন্ধ বেণু—কালো বেণু!

তখনও সে আমার বুকের উপরে তেমনি নিসাড় হয়ে পড়েছিল। ভোরের আধা আলোয়, আধা ছায়ায় বেণুর অন্ধ চোখ ও কালো দেহের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লাম। তেমন করে আগে কখন' তাকে দেখি-নি, পরেও কখন' দেখ্‌বার সময় পাইনি।

তার চোখের পাতাদুটির উপরে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। পদ্মপুটে বন্দী বৃষ্টিবিন্দু নাড়া পেলে যেমন ঝরে পড়ে, বেণুর চোখ থেকেও তেমনি ঝর-ঝর করে আবার অশ্রু ঝরে পড়্‌ল।

"বেণু!"

"ওগো নাগো না, আর অমন কর্‌ব না!"

"কি কর্‌বে না?"

"আর কাঁদ্‌ব না!"

আমার অবরুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করে বলে উঠলুম—"না,—কাঁদ তুমি। আমিও কাঁদি।"

ঘ

তারপর? তারপর আমার জ্বর, বসন্তরোগে দাঁড়াল। বসন্ত

আমাকে প্রাণে মার্‌লে না, কিন্তু আমার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে গেল।

বেণুর মত আমিও অন্ধ!

বেণুকে জীবনে সেই একবারমাত্র দেখেছিলুম। তাকে দেখার আশা মিট্‌ল কৈ? এই ঘন অন্ধকার ঠেলে তার একটা ছায়ামূর্ত্তি বিদ্যুতের মত এক-একবার চম্‌কে ওঠে বটে, কিন্তু তাতে যে তৃপ্তি হয় না গো, তৃপ্তি হয় না।

সোণার চুড়া

ক

অমলা যখন এতটুকু মেয়ে, তখন এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, "এ মেয়ে রাজরাণী হবে।" অমলার রাণীর মত রূপ দেখিয়া দৈবজ্ঞ একথা বলিয়াছিল, না তার ভাগ্যলিপি পড়িয়া এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, সেটা আগে কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। তবে কথাটা শুনিয়া অমলার বাপ হাসিয়াছিলেন, তার বিধবা পিসী অমলার মৃত মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং "দক্ষিণায় পূর্ণহস্ত" হইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর সহর্ষে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

কলিতেও ব্রাহ্মণ-বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তবে কল্পনার রাজা, খাটো হইয়া বাস্তবে রাজেন্দ্রে পরিণত হইল। বাঙ্গলা দেশে তাঁহার কন্যার করপ্রার্থী রাজামহারাজার অন্যায় এবং আশ্চর্য্যরকমের অভাব দেখিয়া অমলার পিতা শেষটা বাধ্য হইয়া রেলোয়ে অফিসের পঁয়ত্রিশটাকা মাহিনার কেরাণী রাজেন্দ্রবাবুর হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিলেন। কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়া অমলার বাপ আর একবার হাসিলেন। অমলার মৃত মাকে স্মরণ করিয়া পিসীমা আর একবার কাঁদিলেন, এবং লুচির কোণ্ ভাঙ্গিতে-

ভাঙ্গিতে পাড়ার দৈবজ্ঞঠাকুর আর একবার ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "দেখেনিও, ঐ রাজেন্দ্রই পরে রাজরাজেন্দ্র হবে। আমার গণনা মিথ্যা হবার নয়!"

সে আজ আট বৎসরের কথা।

খ

সেদিন মাসকাবার।

অফিস হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্র, মাসের খরচ দেখিতেছিল। "বাড়ী-ভাড়া আঠার টাকা, ঝী'য়ের মাইনে তিনটাকা, দুধ-বার্লি চারটাকা, মাসকাবারি জিনিষ-পত্রের জন্যে মুদির দোকানে কম করে ধরেও অন্তত ছয়টাকা, সকলকার জলখাবার চারটাকা। মাইনে পাই চল্লিশটাকা—হাতে রইল পাঁচটাকা। আর কি কি খরচ বাকী রইল গা?"

অমলা বলিল, "বাজার-খরচ ভুলে গেলে বুঝি?"

রাজেন্দ্র বলিল, "কিচ্ছু ভুলিনি—আমি ভুল্‌লেও তোমরা ভুল্‌বে কেন? তবে কথাটা কি জান? আর আর খরচের কথা মনে কর্ত্তেও আমার ভয় হচ্চে।"

অমলা বলিল, "এমাসে অন্তত দুজোড়া কাপড় না হলে চল্‌বে না, তা জান?"

মুখ বেঁকাইয়া রাজেন্দ্র বলিল, "জানি না আবার! খুব জানি! তার পর?"

"রজকের তিনমাসের পাওনা বাকী আছে। এবারে দাম চুকিয়ে না দিলে সে আর কাপড় কাচ্‌বে না।"

"বলে যাও—"

"খুচ্‌রো খরচ আছে।"

"যথা—?"

"সে কি আর হিসেব করে বলা যায়? হঠাৎ আপদ্‌-বিপদ্‌, কোথাও যাওয়া-আসা, আত্মীয়-কুটুম্বিতে (রাজেন্দ্র হতাশভাবে আড়্‌ হইয়া মাছুরে শুইয়া পড়িল) নাপিত-নাপ্‌তিনী, ছেলের স্কুলের মাহিনা—এমন আরো কত কি!"

শুইয়া-শুইয়া দুইচোখ বুঁজিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "ওগো, একটা হিসেব ভুলেছ।"

"কি?"

"অর্দ্ধেক রাজত্ব-কেনার কথাটা। এ মাসে সেটাও ত' অবিশ্যি করে কেনা চাই?"

অমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর হাসিয়া বলিল, "চাই বই কি! জ্যোতিষ ঠাকুর বলেছিল, তুমি নিশ্চয় রাজা হবে—মনে নেই? রাজত্ব নইলে চল্‌বে কেন?"

রাজেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া মুখভার করিয়া বলিল, "তোমার হাসি আস্‌চে অমলা? আমার ত' কান্না পাচ্চে!"

অমলা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "এখনি কান্না? এখনো যে চাল আর কয়লার ফর্দ্দ বাকী আছে!"

রাজেন্দ্র গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। মাঝেমাঝে ঘরের এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যে'দিকে চায়, সেইদিকেই সে এক একটা নূতন অভাবের চিহ্ন দেখে, আর তার বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া ওঠে। ঐ ও-দিকের কুলঙ্গিতে একটা চিম্‌নিহীন ল্যাম্প্‌ রহিয়াছে; চিম্‌নিটা

কাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ আর একটা না কিনিলে নয়। এদিক্‌কার দেওয়ালে একখানা ছেঁড়া কুটিকুটি গামোছা ঝুলিতেছে। এখানে একখানা ভাঙ্গাচোরা আয়না, ওখানে একটা ছেঁড়া কামিজ। সমস্ত অভাব যেন মূর্ত্তি ধরিয়া রাজেন্দ্রকে ভয় দেখাইতে লাগিল। হাতে পয়সা না থাকিলেও মাসের অন্যান্য দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া যায়; কিন্তু কেরাণীর সংসারে যেদিন টাকা আসে, সেই কাঙ্ক্ষিত মাসকাবার অতি—অতি ভয়ানক! অমলা বলিল, "কি ভাব্‌চ?"

তিক্তস্বরে রাজেন্দ্র বলিল, "চিতার আগুনের কথা।"

"ভাব্‌লে আগুন জ্বল্‌বে বৈ নিব্‌বে না।"

"জ্বলুক। সমস্ত জ্বলে-পুড়ে থাক্ হয়ে যাক্। আমি বাঁচি।"

"ছিঃ, তুমি না পুরুষ?"

"ভগবান্, আস্‌চে জন্মে আমি যেন স্ত্রীলোক হয়ে জন্মাই। কি বল অমলা, স্ত্রীলোক হলে আর ত আপিসে কেরাণীগিরি কর্ত্তে আর কলম পিষে মর্ত্তে হবে না?"

"হ্যাঁগো, আমরা কি বড় সুখে আছি?"

"সুখে নেই? যে হাস্‌তে পারে, তার আবার দুঃখ কি? তুমি হাস্‌চ, আমি হাস্‌তে পার্‌চিনে কেন?

"ও-সব কথা আর ভেব না। এখন কি কর্ব্বে, বল?"

"কর্ব্ব আমার মাথা আর মুণ্ডু। বাকী আছে বাজারখরচ, কাপড়, ধোপার মাইনে, খুচরো খরচ, আর চাল, কয়লা। অন্য খরচ ক'রে হাতে থাকে পাঁচটাকা—সে ত সমুদ্রে শিশির। আমার অবস্থায় পড়্‌লে অন্য কেউ কি কর্ত্ত জান?"

"জানি।"

"কি ?"

অমলা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "স্ত্রীকে চুম্বন।"

"আত্মহত্যা—আত্মহত্যা কর্ত্ত! এখনো ঠাট্টা? এই রইল তোমার পাঁচটাকা—তোমার যা-খুসী কর!" বলিয়া, রাজেন্দ্র একখানা পাঁচটাকার নোট অমলার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা আজ সুধু পৃথিবীতে নামিয়া আসিল না;—নামিয়া আসিল অমলার অন্ধকার প্রাণের ভিতরেও। হাতের উপরে মুখ রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে অমলা সেইখানে মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার মুখে তখন হাসি নাই, চোখে অশ্রু।

গ

অমলা তিন সন্তানের মা, কিন্তু তাকে দেখিলে সে-কথা বলিবার যো ছিল না। তার গড়ন ছিল পাত্‌লা, ছিপ্‌ছিপে; রং টক্‌টকে গৌর, মুখচোখ প্রতিমার মত। মাতৃত্বের পূর্ণগৌরব তার দেহ থেকে যৌবনকে শুক্‌না ফুলের মত খসাইয়া দিতে পারে নাই।

কিন্তু দরিদ্রের ঘরে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অবকাশ কোথায়? যেখানে অর্থ নাই, সেখানে রূপযৌবন সব ব্যর্থ। রাজেন্দ্র তাহাকে ভালবাসিত; কিন্তু নিত্য-নূতন গহনায়, বিলাসের উপহারে ও মিষ্টকথায় সে ভালবাসাকে জাহির করিবার সময় তার ছিল না। সংসারের টানাটানিতে তার মন সর্ব্বদাই তিক্তবিরক্ত হইয়া থাকিত;—এমন-কি, অমলাকে ভালকথা বলিতে গেলেও, তার জিভ্ ফস্কাইয়া মন্দকথা বাহির হইয়া যাইত।

এর জন্যে পরে সে নিজেই মনে-মনে দুঃখিত হইত। অমলাও মুখ বুজিয়া এই ভালবাসার অত্যাচার সহিয়া থাকিত।

মন তবু বুঝিয়াও বোঝ মানে না। আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে একরকম খালিহাতে খালিগায়েই সে নিমন্ত্রণে যাইত। তাহার স্বভাব-সুন্দর রূপ গহনা না-থাকার দরুণ বড় বেশী কমিয়া যাইত না বটে, কিন্তু যখন কোন ধনীর ঘরণী, গায়ের জড়োয়া গহনায় আলোর ঢেউ তুলিয়া চোখে অবজ্ঞার বিদ্যুৎ হানিয়া, দেমাকে ডগমগ হইয়া অমলার নিরলঙ্কার দেহের দিকে বাঁকা-চোখে চাহিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিত, অমলার তখন মনে হইত, সে-যেন সকলকার পায়ের তলায় ধূলার মত মিশিয়া আছে।

কোন কোন মুখরা আবার আত্মীয়তা জানাইয়া বলিত, "তোমার বর কি কাজ করে ভাই?"

অমলা মৃদুস্বরে বলিত, "কেরাণীগিরি।"

"তা এমন রাঙ্গা বৌয়ের গায়ে দুখানা সোণা-দানাও দিতে পারে না গা? আহা—"

অমলা অতিকষ্টে বলিত, "আমি কখনো চাই নি—"

"ওমা, চাইতেই বা যাবে কেন? চাইলে দেবে, নইলে দেবে না, এমন কথাও ত' কখনো শুনিনি! আমরা যে গয়না পরি, এ কি ভিক্ষে ক'রে পরা? এমন মেয়ে আমরা নই—জিভ্ কেটে ফেলব, তবু সেধে মুখফুটে কিছু চাইতে পারব না—"

অমলা ম্রিয়মাণ হইয়া উত্তর দিত, "সংসারে গয়নাই ত' সব নয়! আর, আমার স্বামীর এমন অবস্থা নয় যে, তিনি আমাকে—",

"তাই বল বাছা, তাই বল! ওসব—"

কথা শেষ হইবার আগেই অমলা সেখান হইতে চলিয়া যাইত

ঘ

মুখে অমলা যাই বলুক, মনে-মনে সে বড় সুখী ছিল না। হাজার হোক মানুষের মন ত!

সেদিন অমলার এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে বিয়ের এক নিমন্ত্রণ আসিল।

রাজেন্দ্রের কাছে গিয়া অমলা বলিল, "ওগো, আইবুড়ো-ভাতের কাপড় আর মিষ্টি পাঠাতে হবে যে!"

রাজেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "পয়সা কোথায়?"

অমলা বলিল, "সংসার কর্ত্তে গেলে এ-রকম দু'একটা বাজে-খরচ না কর্‌লে চলবে কেন? মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ত!"

"চুলোয় যাক্ মান! মান কি আছে, যে রাখ্‌বে? লেখাপড়া শিখে যেদিন সায়েবের বুটের তলায় দাসখৎ লিখে দিয়েছি, সেইদিনই যে মানে ছাতা ধরে গেছে! তোমার পয়সা থাকে, তুমি আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব পাঠাও!"

"আমি কোথায় পয়সা পাব?"

"তবে তত্ত্বের কথা ভুলে যাও।"

"তারা কি মনে কর্‌বে?"

"গণৎকার হলে সে কথা আগে থাক্‌তে তোমাকে গুণে বলে দিতে পার্ত্তাম।"

* * * * *

অস্তসূর্য্যের স্নিগ্ধ আলো অঙ্গে মাখিয়া দীপ্ত-নীল আকাশের তলায় একঝাঁক পায়রা একছড়া উড়ন্ত যুঁইফুলের মালার মত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

ছাদে কাপড় তুলিতে গিয়া, অমলা সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হঠাৎ অমলার পায়ের কাছে সশব্দে কি-একটা জিনিষ আসিয়া পড়িল। অমলা, চমকিয়া দেখিল, একটা ঢিল। তার সঙ্গে খানিকটা সূতা বাঁধা। সূতার ডগায় একখানা কাগজ ঃ—

এর মানে কি ?

অমলা হেঁট হইয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল। তাহাতে ভুর্-ভুরে এসেন্সের গন্ধ। কাগজের ভাঁজ খুলিয়া অমলা দেখিল, ভিতরে পরিষ্কার হাতের অক্ষরে কয়ছত্র লেখা ঃ—

"তোমার জন্য আমি পাগল। আমার দিকে মুখ তুলে তাকালে তুমি যা চাও তাই দেব। গরিব কেরাণী তোমার কদর বুঝ্‌বে না। দয়া করো। নইলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

অমলা, চিঠি পড়িয়া মনে-মনে বলিল, "তোমার পক্ষে মরাই ভাল।" এ চিঠি কার ? কে লিখিতেছে ? পত্রে কাহারও নাম ছিল না। আমার পায়ের কাছে কাগজখানা আসিয়া পড়িল কেন ? তবে কি— অমলা একপলকে সব বুঝিল।

গোধূলির আলো তার গৌরবাহুকে কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অমলার চোক তার উপরে পড়িল। সে হাতদুটি কেমন নধর, কেমন নিটোল !

এ চিঠি লইয়া কি করিবে সে? ছিঁড়িয়া ফেলিবে, না স্বামীকে দেখাইবে? অমলা ভাবিতে লাগিল!

অমলাদের বাড়ীর সুমুখে একটা রাস্তা। ওপারে, ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি একখানা মস্ত বাড়ী। পল্লীগ্রামের কোন ধনী জমিদার মাসখানেক হইল, এই বাড়ীখানা ভাড়া লইয়াছেন।

অমলার দৃষ্টি আচম্‌কা সেই বাড়ীর ছাদের উপরে পড়িল।

সেদিকে চাহিয়াই, মাথায় ঘোমটা টানিয়া অমলা তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

সে বাড়ীর ছাদের উপরে এক সুশ্রী যুবা, নিষ্পলকনেত্রে হাস্যমুখে অমলার দিকে তাকাইয়া, নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

যাইবার সময়ে অমলা, চিঠিখানা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

কিন্তু, স্বামীকে সে কোনকথা বলিল না।

৬

অমলা, কয়দিন আর ছাদে উঠে নাই।

সেদিন বৈকালে সে রুটি সেঁকিতেছিল আর তাহার ঠিকা ঝী রুটি বেলিয়া দিতেছিল।

বেলিতে-বেলিতে ঝী বলিল, "একটু হাত চালিয়ে নাও দিদিমণি!"

অমলা বলিল, "ক্যান্‌ লা, তোর এত তাড়াতাড়ি কিসের বল্‌তো?"

ঝী বলিল, "এই মাগ্যির বাজারে এক জায়গায় ঠিকে কাজ করে তো পেট চলেনা দিদি! কাজেই আর এক জায়গায় কাজ না কর্‌লে পোষায় না।"

অমলা, উনানের আঁচ্ একটু কমাইয়া দিয়া বলিল, "আর কোথায় কাজ করিস্ তুই ?"

"এই তোমাদের সামনের বাড়ীতে।"

অমলা চমকিয়া উঠিল। উনান হইতে চাটুখানা নামাইয়া, মনের চাঞ্চল্য মনেই চাপিয়া সহজস্বরে সে বলিল, "ওখান থেকে কত মাইনে পাস্ ?"

"সকালে-বিকেলে যাই, পাঁচটাকা করে দেয়।"—

অমলার চম্কানি ঝীয়ের নজর এড়ায় নাই। কিন্তু, সেকথা নিয়া কিছু বলিল না— আপনমনে সে মৃদু-মৃদু হাসিলমাত্র।

অমলা খুন্তি দিয়া একখানা রুটি কড়ার উপরে উল্টাইয়া দিতে লাগিল। খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, "হাঁরে, ও-বাড়ীতে কে থাকে ?"

"এক জমিদারের ছেলে গো !"

"আর কে ?"

"বাবুর মা, বিধবা বোন আর এক খুড়্তুতো ভাই।"

"বাবুর বৌ থাকে না ?"

"বাবুর বিয়ে ত হয় নি।"

"অত বয়েস হয়েছে, বিয়ে হয়নি কিলো ?"

"বাবুকে তুমি কি করে দেখ্লে দিদি ?"

অমলার মুখ কালিপানা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "হ্যাঁরে, ওরা বুঝি খুব বড়মানুষ ?"

ঝি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ওমা, তা আবার নয় দিদি ! বড়মানুষ

বলে বড়মানুষ! বাসাবাড়ী, তবু লোকজন চারিদিকে যেন রৈ-রৈ করছে! গাড়ী-ঘোড়া জিনিষপত্তর দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়! শুনলে অবাক্‌ হবে দিদি, ওরা সব রূপোর বাসনে 'সরে'।"

অমলা আনমনা হইয়া বলিল, "তা হবে না কেন; বড়লোকের ভিন্‌গোত্তর! একি আর আমরা, যে ছেঁড়া ন্যাকড়াতেই জীবন কেটে যাবে?"

ঝী দরদ দেখাইয়া বলিল, "তা' সত্যি দিদিমণি! তোমার অমন প্রতিমের মত রূপ, অমন নিটোল গড়ন, ওতে কি তুখানা সোণাদানা না পর্‌লে সাজন্ত হয়?"

"কোথায় পাব বাছা, সোণাদানা ত' পথের ধূলো নয়!"

"কেন, দাদাবাবুকে বল্‌তে পার না?"

"বলে কি হবে? খেতে-পর্‌তেই কুলোয় না, তা আবার সোণাদানা!"

"হ্যাঁ দিদিমণি, দাদাবাবু তোমায় আদর-আয়িত্তি করে ত?"

অমলা কৌতুকভরে হাসিয়া বলিল,

"আলুনি আদর ট্যাপের খৈ—
আদরের কথা কার কাছে কই!"

বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "নে, রুটি ব্যাল্‌—উনুন যে কামাই যাচ্ছে!"

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। রুটি-বেলা শেষ হইয়া গেলে পর, বেলুন ও চাকীখানা সরাইয়া ঝী অমলার মুখের ভাবখানা খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর মৃতুস্বরে বলিল, "পুরুষ-গুলা কি-রকম বে-আক্কেল দিদিমণি!"

অমলা চাটু হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "পুরুষগুলো আবার কে?"

"এই ও-বাড়ীর জমিদারের ছেলে গো, এতক্ষণ যার কথা হচ্চিল!"

"কেন, সে কি করেচে?"

"বল্‌ব?"

"বল্‌।"

"আমরা গরীবমানুষ, গতর খাটিয়ে খাই—কারুর সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। বল্‌লে শেষটা ত আমার ওপরে রাগ কর্‌বে না ঠাক্‌রুণ্‌?"

অমলা চকিতে ফিরিয়া, ঝীয়ের দিকে তীক্ষ্ণনেত্রে চাহিল। বলিল, "বুঝেচি। কি বলেচে, সব খুলে বল্‌।"

অমলার কণ্ঠস্বর কঠোর!

ঝী থতমত খাইয়া গেল। সে যা বলিতে যাইতেছি— তা আবার চাপা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অমলার দৃষ্টি যেন তার মনের কথাগুলাকে হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিয়া তাহার জিভের ডগায় আনিয়া দিল। কলের পুতুলের মত সে বলিয়া গেল, "ও-বাড়ীর বাবু কাল আমাকে ডেকে বল্‌লে, 'ঝী, ঐ সামনের বাড়ীর বৌ'কে তুমি যদি আমার কথা জানিয়ে আস্‌তে পার, আমি তোমাকে এক-শো টাকা দেব।'—আমায় বল্‌লে, আমি কি কর্‌ব দিদি?"

অমলা কিছু বলিল না। উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া, সে উনানে কড়া চড়াইয়া দিতে গেল; কিন্তু তাহার হাত ফস্কাইয়া কড়াখানা ঘিয়ের কেঁড়ের উপরে পড়িল। কেঁড়েটাও সশব্দে উল্টাইয়া গেল। সেই শব্দে উপর হইতে রাজেন্দ্র নামিয়া আসিল। মেঝেতে তখন ঘি গড়াইতেছে। রাজেন্দ্র

বিরক্তস্বরে বলিল, "কাজ যত না হোক্, অকাজ কর্‌তে তোমরা খুব মজবুৎ! বেশ যাহোক্!"

উত্তেজিত অমলা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "পুড়ে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেলুম, আর তুমি কিনা উল্টে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ করে কথা শুনিয়ে দিতে এলে?"

রাজেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কথা শোনাব না কেন! অতটা ঘি যে খাম্‌কা নষ্ট হ'ল, এই মাগ্যির বাজারে সেটা কোথা থেকে আসে শুনি?"

অমলার মন সেদিন হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিল। স্বামীর অন্যায় ও নিষ্ঠুর কথা সে কিছুতেই মুখ বুজিয়া সহিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কি সাধ করে তোমার লোক্‌সান করেছি? খেটে-খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, বল্‌তে তোমার লজ্জা হচ্চে না?"

রাজেন্দ্র তখন সবে আপীশ থেকে ফিরিয়াছে, তাহার মেজাজটাও বিলক্ষণ চড়া ছিল। সেও মহা খাপ্পা হইয়া বলিল, "বড় যে লম্বা-লম্বা কথা হচ্চে, ওসব আমার বাড়ীতে বসে হবে না—বুঝলে? এটা তোমার বাপের বাড়ী হলে, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌তুম।"

"কি! তুমি আমার বাপ তুল্লে? এতবড়"—

অমলা আর কথা শেষ করিতে পারিল না। ঝড়ের মত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দুম্ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

চ

অমলার চোখ সুমুখের বাড়ীর উপরে পড়িল।

সেখানে, বাড়ীর এক জানালায় দুটি ক্ষুধিত নয়নের লোলুপ দৃষ্টি অমলার ঘরের দিকে স্থির হইয়া ছিল।

অমলা সে দৃষ্টি দেখিল। যাহার সে দৃষ্টি, সেও অমলাকে দেখিল।

অমলা ছবির মত নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে দৃষ্টি যেন সর্পের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে! কিন্তু, তবু সে সেখান হইতে এক পা'ও নড়িতে পারিল না।

ছুটিয়া গিয়া সামনের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য, তাহার মনের ভিতরে একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কেমন-একটা অন্যায় দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়ের মধ্যে সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল।

জানালা খোলাই রহিল।

সে দৃষ্টি তখনও স্থির—এবং, তেমনি ক্ষুধিত, তেমনি ব্যগ্র!

সে-যেন অমলাকে গ্রাস করিতে চায়, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে চাহে!

সে দৃষ্টির কি মোহ!—চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নির মত সে দৃষ্টি জ্বলিতেছিল, জ্বলিতেছিল জ্বলিতেছিল!

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে অমলার মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সেই কান্নায় অমলার সাড়্ হইল।

থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে অমলা মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল।

* * * * *

সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে আর কথাবার্ত্তা হইল না; তার পরদিন না—তার পরের দিনও না! অভাবের সংসারে ঝগড়া কিছু নূতন ব্যাপার নয়; তার

আগেও অনেকবার তারা ঝগড়া করিয়াছে। কিন্তু এবারকার ঝগড়ার এই নীরবতা কিছু নূতনতর।

মুখ ফস্কাইয়া আল্‌টপ্‌কা একটা খারাপ কথা বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া রাজেন্দ্র এখন মনে-মনে অনুতপ্ত। স্ত্রীর সঙ্গে আবার মিট্‌মাট্‌ হইয়া গেলে সে বর্ত্তিয়া যায়; কিন্তু আগে থাকিতে সাধিয়া কথা কহিলে পাছে তাহার স্বামিত্বগৌরব খর্ব্ব হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করিল না।

সংসারে কোন বড় ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া আমরা ছোট ঘটনাকে অবহেলা করিয়া এড়াইয়া যাই। কিন্তু সাংসারিক ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি সাধারণের চোখে তুচ্ছ হইলেও অনেক সময়ে তাহারাই বড় ঘটনার জন্ম দেয়—বীজ যেমন ছোট হইয়াও বড় গাছের জন্ম দেয়। আমরা এটা বুঝি না বলিয়াই অনেক সময়ে অনেক বড় ঘটনার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

ছ

এ-কয়দিন অমলা রোজ ছাদে উঠিয়াছে, আর রোজ চিঠি পাইয়াছে।

চিঠিগুলা যখন সে কুড়াইয়া লইত, তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত, অন্য বাড়ীর ছাদ হইতে আর একজনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার উপরে স্থির হইয়া আছে। অমলার মনে হইত, সে দৃষ্টি হইতে যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আসিয়া তাহার দেহের মাংস ভেদ করিয়া বুকের ভিতরে গিয়া স্পর্শ করিতেছে। পাছে চোখোচোখি হয় সেই ভয়ে সে আপনার দৃষ্টিকে নত করিয়া রাখিত।

কতবার সে মনে করিয়াছে, চিঠি পাইলেই ছাদের উপরে দাঁড়াইয়াই কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে! কিন্তু চিঠি পাইয়া তাহার মনে হইত, ভিতরে না-জানি কত রহস্যই আছে; একবার না পড়িয়া কি ফেলিয়া দেওয়া যায়?

তাহার রূপ নিয়া যতটা অত্যুক্তিপ্রকাশ করা যাইতে পারিত, পত্রলেখক তাহা করিত। সে-সব পড়িয়া অমলা খুসী হইত এবং মনে-মনে গর্ব্ব অনুভব করিত। পত্রে আরও কত কথা ছিল,—প্রেমের কথা, নিরাশার কথা, মিলন ও বিরহের কথা!

কথাগুলা অমলার মন্দ লাগিত কি? বোধ হয়, না। কারণ, সেইটেই স্বাভাবিক। অমলা দরিদ্র-ঘরণী, সংসারের অভাব ও জ্বালা-ঝঞ্ঝাটের ভিতরে তাহার রূপ বনফুলের মত অনাদৃত হইয়া থাকিত, একথা আগেই বলা হইয়াছে। আপনার যৌবন-বসন্তে ভাল করিয়া কোকিলের সাড়া সে কখনও শুনিতে পায় নাই—তাহার জীবনের একটা মধুর অংশ অনেকটা অপূরস্ত হইয়া ছিল। আজ এক ধনীর নন্দন তাহার চরণ-পূজা করিতে চাহিতেছে, ইহাতেও অবিচল থাকা অমলার পক্ষে বড় শক্ত কথা। হয়ত তেমনধারা মনের বলও তাহার নাই। আর এই সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তাহাকে সৎপরামর্শে সাবধান করিবার লোকও সংসারে স্বামী ছাড়া আর কেহ ছিল না। কিন্তু, স্বামীর সঙ্গেও তাহার কথা বন্ধ!

*　　*　　*　　*

আরসিতে অমলা মুখ দেখিতেছিল,—হাঁ, তাহার চোখের কোণ্ হইতে অটুট যৌবনের চঞ্চল বিদ্যুৎ এখনও সরিয়া যায় নাই; কপোলের

গোলাপী রং অযতনে একটু মলিন হইলেও এখনও বিবর্ণ হইয়া যায় নাই। ঝী-মুখপুড়ী ঠিক বলিয়াছে,—প্রতিমার মত রূপই বটে! এ রূপ হু'খানা সোণাদানা না হইলে কি মানায়?

আপনার হাতহু'খানি সে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিল। ক-গাছা কালোরংয়ের 'জলতরঙ্গ' চুড়ী রিণিরিণি করিয়া তাহাকে যেন উপহাস করিতেছিল। চুড়ীগুলাকে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তাহার মনে একটা দুর্দ্দম বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ চুড়ী ভাঙ্গিলে ফের কাচের চুড়ী কেনাও যে তার পক্ষে শক্ত কথা!—ভ্রূসঙ্কোচ করিয়া অমলা বিরক্তভাবে হাতনাড়া দিল,—কাচের চুড়ীগুলা কৌতুকহাস্যে কলধ্বনি করিয়া উঠিল, রিণিঝিনি রিণিঝিনি রিণিঝিনি!

পরণের কাপড়খানা ছেঁড়া-খোঁড়া, রান্নাঘরের ধোঁয়ামাখানো। ছেঁড়া মেঘে চাঁদের আলোর মত, ছিন্নবস্ত্রমধ্য দিয়া তাহার শুভ্র দেহের লাবণ্য স্থানে স্থানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার স্বামীর সকল ব্যবহারের ভিতরে আজ সে একটা গভীর অবহেলা অনুভব করিল। সকলেই কিছু বড়লোক হয় না, মুখের দুটি মিষ্টি কথাতে ত' আর পয়সা লাগে না! তার স্বামী যে তাতেও নারাজ!

তিক্তবিরক্ত চিত্তে অমলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘোরঘটা করিয়া সেদিন অবিরাম বাদল নামিয়াছে! শূন্যপথে ধূর্জ্জটী যেন আজ মহা তাণ্ডবে মাতিয়া আছেন,—ঐ নিকষ-কালো মেঘপুঞ্জ যেন তাঁহারই নৃত্যোৎক্ষিপ্ত জটাজূটের রুদ্রলীলা প্রকাশ করিতেছে এবং বিদ্যুতে-বিদ্যুতে যেন তাঁহারই নেত্রবহ্নি রহিয়া-রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! পথ প্রায় জনশূন্য, কেবল মাঝেমাঝে এক-একজন পথিক ছাতিতে

কোনরকমে কাঁধ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া নির্জীবের মত আস্তে-আস্তে চলিয়া যাইতেছে। দূরের বাড়ীগুলা অস্পষ্ট, তাহাদের পিছন হইতে দুই তিনটি তালগাছের ঝাপসা-সবুজ মাথা ঝোড়ো-বাতাসে হেলিয়া-হেলিয়া পড়িতেছিল। কতকগুলা কাক উড়িয়া-উড়িয়া তালগাছের উপরে বসিতেছিল, আবার উড়িতেছিল,—অমলা উদাসচোখে তাহাই দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছনে দরজা-খোলার শব্দ হইল। অমলা ফিরিয়া দেখিল, ঝী।

একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বৃষ্টিতে তুই কোথা থেকে এলি ?"

মুখ টিপিয়া একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া ঝী বলিল, "আকাশ থেকে খসে পড়্‌লুম দিদিমণি !"

অমলা বেশ বুঝিতে পারিল, ঝীয়ের এই হঠাৎ আবির্ভাব ও ধরণ-ধারণে একটা-কিছু ব্যাপার লুকোনো আছে। সন্দিগ্ধস্বরে সে বলিল, "তোর কি দরকার রে ?"

"একজন পাঠিয়েচে।"

অমলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আস্তে-আস্তে সে বসিয়া পড়িল।

ঝী বলিল, "আমি কি কর্‌ব বল দিদিমণি! আমরা চাকরি করি, যা বলে তা দাঁতে কুটো নিয়ে তখনি কর্‌তে হয়।"

অমলা চুপ করিয়া রহিল।

ঝী ভরসা পাইয়া বলিল, "আর তাও বল্‌তে হবে দিদি, মানুষটা তোমাকে দেখে পাগলের মত হয়ে গেছে।"—কথাটা শুনিয়া অমলার মুখ কি-রকমধারা হয়, তাহা দেখিবার জন্য সে সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিন্তু অমলার মুখ একেবারে ভাবশূন্য, সে একেবারে চুপচাপ।

"সুধুকি তাই দিদি? আবার দেখনা কি সব পাঠিয়েচে!" বলিয়া ঝী তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে একটি মখ্‌মলের বাক্স বাহির করিল। বাক্সের ডালা খুলিয়া আবার বলিল, "দেখ্‌চ দিদি, কেমন সব ভারি-ভারি গয়না! এই দেখ চন্দ্রহার, এই দেখ তাগা, বালা,—আর এগুলো কি দেখ্‌চ? পালিসপাতার চুড়ী! আরো কত গয়না গড়্‌তে দিয়েচে,—ভাল সাঁচ্চা সল্‌মা-চুম্‌কীর কাপড়ের ফর্‌মাজ দিয়েচে। কিগো! অমন ক'রে বসে রইলে যে? একবার তবুও জিনিষগুলো নেড়েচেড়ে দেখ!"

অমলা নড়িল না। সে গহনার বাক্সের দিকে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল।

জ

ঝী যখন অমলাকে ঘরের ভিতরে একলা রাখিয়া চলিয়া গেল, তখনও সে তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

তাহার সাম্‌নে সেই গহনার বাক্স। বাক্সের ডালা খোলা; ভিতর হইতে গহনাগুলা বর্ষার ম্লান আলোতেও ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিতেছিল। অমলা নিষ্পলকনেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

এ গহনা তাহার! অমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু কে দান করিতেছে, আর—আর, কেন এ দান? সে-কথা ভাবিবামাত্র তাহার বুক ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল।

আস্তে-আস্তে সে হারছড়া কম্পিত হস্তে তুলিয়া নিল। এ হার কত ভরির, কত দামের?—কে জানে! হারছড়া গলায় পরিলে কেমন মানায়

একবার সেটা পরখ্ করিয়া দেখিবার সাধ হইল,—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। যদি কেহ দেখিতে পায়!

বাক্সের ভিতরে ওটা কি? চিঠি বুঝি?—হুঁ, তাই বটে!

অমলা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল :—

"সামান্য উপহার পাঠালুম, না নিলে আমার কষ্ট হবে। পরে আরও পাঠাব, আমার কাছে এলে তুমি যা চাও তাই দেব। এখনও কি তুমি আমায় দয়া করবে না? স্বপ্নে আমি তোমাকে দেখি, তোমা বই আমি আর কিছু জানি না। আর চুপ করে থেকো না, চিঠির উত্তর দিও। উত্তর না পেলে আমি আত্মহত্যা কর্‌ব।"

আবার উত্তর চায়! উত্তর? হাঁ, উত্তর না পেলে আত্মহত্যা কর্‌বে!

আচ্ছা, মানুষটা যদি উত্তর পেলেই তুষ্ট হয়, তাহলে দু-লাইন লিখ্‌তে দোষ কি? তাতে কি পাপ হবে? অমলা আপনাকে আপনি প্রবোধ দিয়া বলিল, না, পাপ আর কি? সেত অন্য কিছু করিতেছে না—সুধু দু-লাইন উত্তর দিতেছে। কিন্তু না,—সে পরস্ত্রী হইয়া পরপুরুষকে কি কথা লিখিবে? তাহার লিখিবার কথা কি আছে?

হালভাঙ্গা নৌকার মত অমলার মন, তাহার বুকের ভিতর দোলা খাইতে লাগিল। কি যে করিবে, কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না। নৌকা যখন এমনি লক্ষ্যহীন, তখন সে সহজেই ডুবুডুবু হয়।

গহনাগুলা যেন অমলাকে আপনাদের মৌন ভাষায় ডাক্ দিয়া বলিতে-ছিল, "ওগো রাণি, আমাদের প্রতি বিমুখ হয়োনা—তোমার দেহখানিকে সুন্দর করতে পার্‌লেই আমাদের জীবন সার্থক হবে! তোমার ঐ পেলব-শুভ্র কণ্ঠ, বাহু ও হস্তের স্পর্শ পেলে আমরা ধন্য হয়ে যাব!"

কি করিব? চিঠি লিখিব, না গহনা ফিরাইয়া দিব?—এতগুলা গহনা!

অমলার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সে আর ভাবিতে পারিল না। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল। অমলার মুখ মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। এ পদশব্দ তাহার স্বামীর!

অমলা হুমড়ি খাইয়া বাক্সের উপরে পড়িল। তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করিয়া বাক্সটা আপনার কোলের ভিতর টানিয়া নিয়া, তাহার উপরে আঁচল চাপা দিল।

ঝ

রাজেন্দ্র, একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহার মুখ আজ প্রসন্ন।

অমলা তাহার দিকে পিছন-ফিরিয়া বসিয়াছিল। রাজেন্দ্র অমলার প্রতি চাহিয়া আপনমনে মৃদুহাস্য করিল। তারপর আল্‌নার সুমুখে দাড়াইয়া আপিসের জামাকাপড় খুলিতে লাগিল।

জামাকাপড় ছাড়িয়া রাজেন্দ্র আস্তে-আস্তে অমলার পাশে গিয়া বসিল।

অমলার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। তাহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল।

স্ত্রীর মুখের দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজেন্দ্র কহিল, "ইস্, আর কতদিনে এ দুর্জ্জয় মান ভাঙ্‌বে গো?"

অমলা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। রাজেন্দ্র যে হঠাৎ কেন তাহার সহিত সাধিয়া কথা কহিতে আসিল, সেটা সে আদোপেই বুঝিতে পারিল না।

রাজেন্দ্র, অমলার এই স্তব্ধভাব দেখিয়া বোধহয় ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে সে ধীরে-ধীরে বলিল, "দেখ অমলা, আমাদের মত গরীব কেরাণীর সংসারে ত্বজনেই ত্বজনার মন বুঝে চলা উচিত। দেখ্‌চ ত, গাধার মত খেটেখেটেও সায়েবের মন পাই না, সর্ব্বদাই বকুনি খাই। এর ওপরে সংসারের টানাটানিতে বাড়ী এসেও মনে কোন সুখ নেই। এ খাটুনি, এ কষ্ট একলা হ'লে কি এতদিন সহ্য কর্‌তাম? খালি তোমাদের মুখ চেয়ে এত অপমান আর কষ্ট সয়ে আছি বইত নয়! সময়ে-অসময়ে মুখ দিয়ে যে ত্বটো অকথা-কুকথা বেরিয়ে যায়, একি আর আমি ইচ্ছে করে করি, অমল?"

অমলার মাথা ক্রমেই নীচু হইয়া পড়িতেছিল।

রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, "তোমাকে যে আমি ভালবাসি, এটা আমি মুখের কথায় বা কাজে প্রকাশ করতে পারি না বলে আমাকে তুমি সন্দেহ কোর না। দেখ, আপিস থেকে আসি তোমারই মুখ ভাবতে-ভাবতে, রাস্তায় আস্‌তে-আস্‌তে এই ভেবে শান্তি পাই যে, বাড়ীতে আমার অপেক্ষায় একজন যত্ন করবার লোক পথচেয়ে বসে আছে! তোমাকে আমি যত্ন করতে পারি না, এজন্যে আমিও মনে-মনে কষ্ট পাই; কিন্তু, কি কর্‌ব, উপায় নেই—উপায় নেই।"—একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আজ চার-বছর আমি আমার জল-খাবারের চারটি করে পয়সা জমিয়ে আস্‌চি। এ-কথা তুমি জান না। আজ ক'দিন হ'ল, আমার মাইনে বেড়েচে, এ-কথা শুন্‌লে তুমিও বোধ করি সুখী হবে; তাই সাহস করে সেই জমানো টাকার ওপরে আরও কিছু টাকা ধার করেচি। কেন জানো? এই জন্যে।"—বলিয়া, রাজেন্দ্র কাপড়ের ভিতর হইতে একটি বেগুনি রংয়ের কাগজের মোড়ক বাহির

করিল। মোড়কটি খুলিলে দেখা গেল, তাহার ভিতরে ক'গাছা নূতন সোণার চুড়ী রহিয়াছে।

অমলার মনে হইল, কে-যেন তাহাকে খুব-একটা উঁচু জায়গা হইতে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। যে স্বামীর ভালবাসাকে এতদিন সে সন্দেহ করিয়াছে, সেই স্বামী যে তাহাকে মৌখিক ভালবাসা জানাইতে না পারিলেও, তাহার জন্য নিজের সামান্য জলখাবারের পয়সা-কয়টিও বাঁচাইয়া আসিতেছেন, এই অজ্ঞাত সত্যকথাটা আজ অমলার সারা জীবনটাই যেন মিথ্যা করিয়া দিল। স্বামীর উপরে মিছা অভিমানে ও সয়তানের প্রলোভনে এখনি সে হয়ত কি করিতে কি করিয়া বসিত! তাহার মন যে এত সহজে বেঁকিয়া যাইতে পারে, এটা সে আদোপেই জানিত না;—ভাগ্যে এখনও এই মুহূর্ত্তের ভুলকে শোধ্রাইবার উপায় আছে! অমলা আপনার রূপকে ধিক্কার দিল, আপনার মনকে ধিক্কার দিল, আপনার অভিমান ও সন্দেহকে ধিক্কার দিল! সোণার চুড়ী পাইয়া অমলার প্রাণে আজ কোন আনন্দই হইল না, তাহার নারী-হৃদয়ের গোপন দুর্ব্বলতা এমনভাবে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে, সে আর আপনাকে সাম্লাইতে পারিল না, নিজের কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া অমলা একেবারে শিশুর মত ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাজেন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, সেদিনকার কটু কথা অমলা বুঝি এখনও ভুলিতে পারে নাই। অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে সে বলিল, "মুখ দিয়ে একটা কথা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে ব'লে কতদিন আর এমন করে থাক্‌বে অমল?"

অমলা প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো আমার বুকটা

দু-পায়ে দলে-পিষে দিয়ে যাও—তোমার পায়ের তলায় পড়ে আমি ধূলোর মত গুঁড়ো হয়ে মরে যাই।”

রাজেন্দ্র অমলার কথার আসল মানে আদোপেই বুঝিতে পারিল না। বোকা বনিয়া, মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, “অমল, তুমি কি বল্‌চ?’

অমলা বুঝিল, সে যদি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়, তাহা হইলে আর লুকাচুরি করিলে চলিবে না। এটা বুঝিয়া সে শক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর চোখের জল মুছিয়া স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, “আমার আর চুড়ী চাই না।”

“অ্যাঁ—সে কি?”

“হ্যাঁ,—আমার গয়না আছে।”

“কি?—কি?”—

“আমার গয়না আছে। এই দেখ।”—বলিয়াই, অমলা তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে গয়নার বাক্সটা বাহির করিয়া দুম্ করিয়া মেঝের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। গহনাগুলা চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র প্রথমটা হতভম্বের মত গহনাগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর জড়িতস্বরে কহিল, “এ সব কি অমলা? গয়না তুমি কোথা থেকে পেলে?”

অমলা সহজস্বরে বলিল, “একজন দিয়েচে।”

“দিয়েচে!—কে?”

“ঐ চিঠিখানা পড়ে দেখ।”

গহনাদাতার পত্রখানা তুলিয়া নিয়া রাজেন্দ্র বিস্ফারিত নেত্রে তাহা পড়িল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “এ চিঠি লিখ্‌লে কে?”

অমলা নিজেই বুঝিতে পারিল না, তার এত জোর, এত সাহস কি করিয়া আসিল? সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টস্বরে বলিল, "যে চিঠি লিখেচে, তাকে দেখ্‌বে?"

বিবর্ণ ও চিন্তিত মুখে রাজেন্দ্র বলিল, "হুঁ।"

জানালার কাছে আগাইয়া গিয়া অমলা বলিল, "এদিকে এস।"

সুমুখের বাড়ীর জানালায় সেই হিংস্র চক্ষুদুটো জ্বলন্ত অগ্নির মত তেমনি সজাগ হইয়া ছিল। অমলাকে দেখিবামাত্র সে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অমলার পাশে রাজেন্দ্রকে দেখিয়াই হঠাৎ আবার কুঞ্চিতফণা সর্পের মতই নত হইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র এতক্ষণে সব ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিল! সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

অমলা ঘরের মেঝে হইতে একে-একে গহনাগুলা কুড়াইয়া আনিয়া, জানালা গলাইয়া অবজ্ঞাভরে রাস্তার উপরে ফেলিয়া দিল। সয়তানের চোখ দেখিয়া আজ সে একটুও ভয় পাইল না।

তাহার অশান্ত বুকটা যেন এতক্ষণ ভারি পাথর হইয়া ছিল; এখন সে শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল,—তাহার মনের সকল ময়লা একেবারে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। * * *

গৃহতলে হাঁটু গাড়িয়া, সে স্বামীর দেওয়া সোণার চুড়ী পরিতে বসিল।

ইতি